বৈশাখ ১৩৯৮
মে ১৯৯১

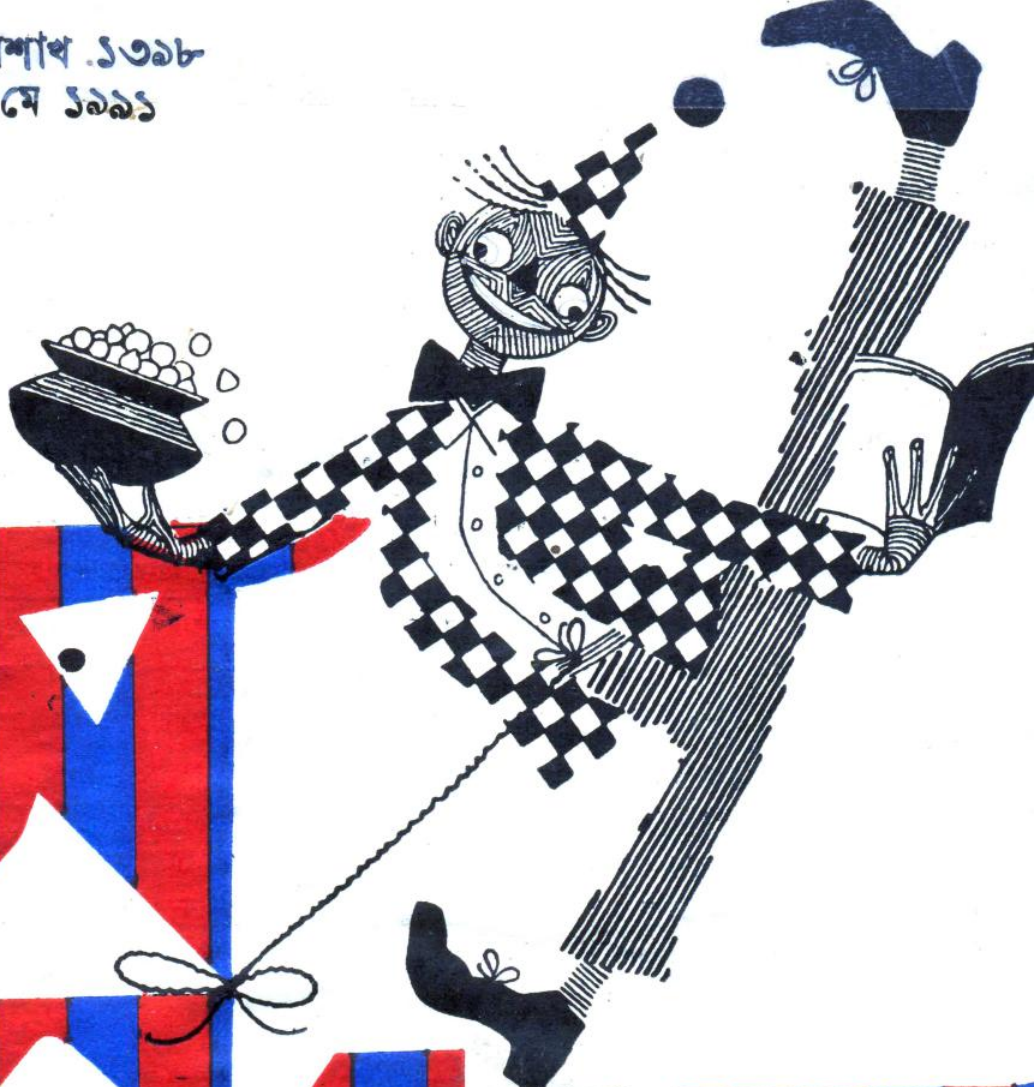

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সন্দেশ

সম্পাদক
লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

সন্দেশের দাম ও চাঁদার হার

প্রতি সংখ্যা ৫·০০, শারদীয়া ৩০·০০ ১৩৯৮-এ দাম বাড়ানো হচ্ছে না

বার্ষিক সডাক ৬২·০০, শারদীয়া সংখ্যা রেজিঃ ডাকে যাবে,
শারদীয়া হাতে নিলে ৫৫·০০, সব হাতে নিলে ৫০·০০

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরাজী মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হয় এবং ডাকে পাঠান হয়।

ইংরেজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বই না পেলে লিখিত নালিশ জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।

সন্দেশের চাঁদা মানিঅর্ডারে, নগদে অথবা 'চেকে' পাঠান যায়। Sandesh নামে চেক লিখবেন, মফঃস্বলের চেক দিলে ভাঙ্গাবার খরচ আট টাকা লাগবে। পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হয় না।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে নামের বাঁ পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র/মেম্বার গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্ট কার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবে না। কোন মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না।

হাতে নিলে পাঁচ, ডাকে নিলে দশ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। আমরা নিজব্যয়ে মফঃস্বল এজেন্টকে পত্রিকা পাঠাব কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে। রেলে ফেরত নেওয়া হয় না। ৫-৯৯ কপিতে ২৫%, ১০০—৩৩·৩৩% কমিশন।

বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করে ছয় সপ্তাহ আগে ব্লক, আর্টপুল, পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি—আনন্দ ঘোষ

সন্দেশ কার্যালয়—১৭১/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৬-৪৯১৯
নিউস্ক্রিপ্টের দোকান—এ-১৫, কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বামনদাস ভট্টাচার্য পাতিরাম বুক স্টল কলেজ ষ্ট্রীট জংশন	রবীন বর্মন টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও হাওড়া এলাকায়	প্রশান্ত নন্দী গড়িয়াহাট বিপনি গড়িয়াহাট মোড়	অবনী দেয়াশী হাজরা মোড়
শ্যামল ভট্টাচার্য ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ (টেমার লেনের মুখে)	বাবলু পাত্র পাত্রবুকস্টল	সুশীল দত্ত শ্যামবাজার	বাকচর্চা কোর্ট কম্পাউণ্ড বর্ধমান-১

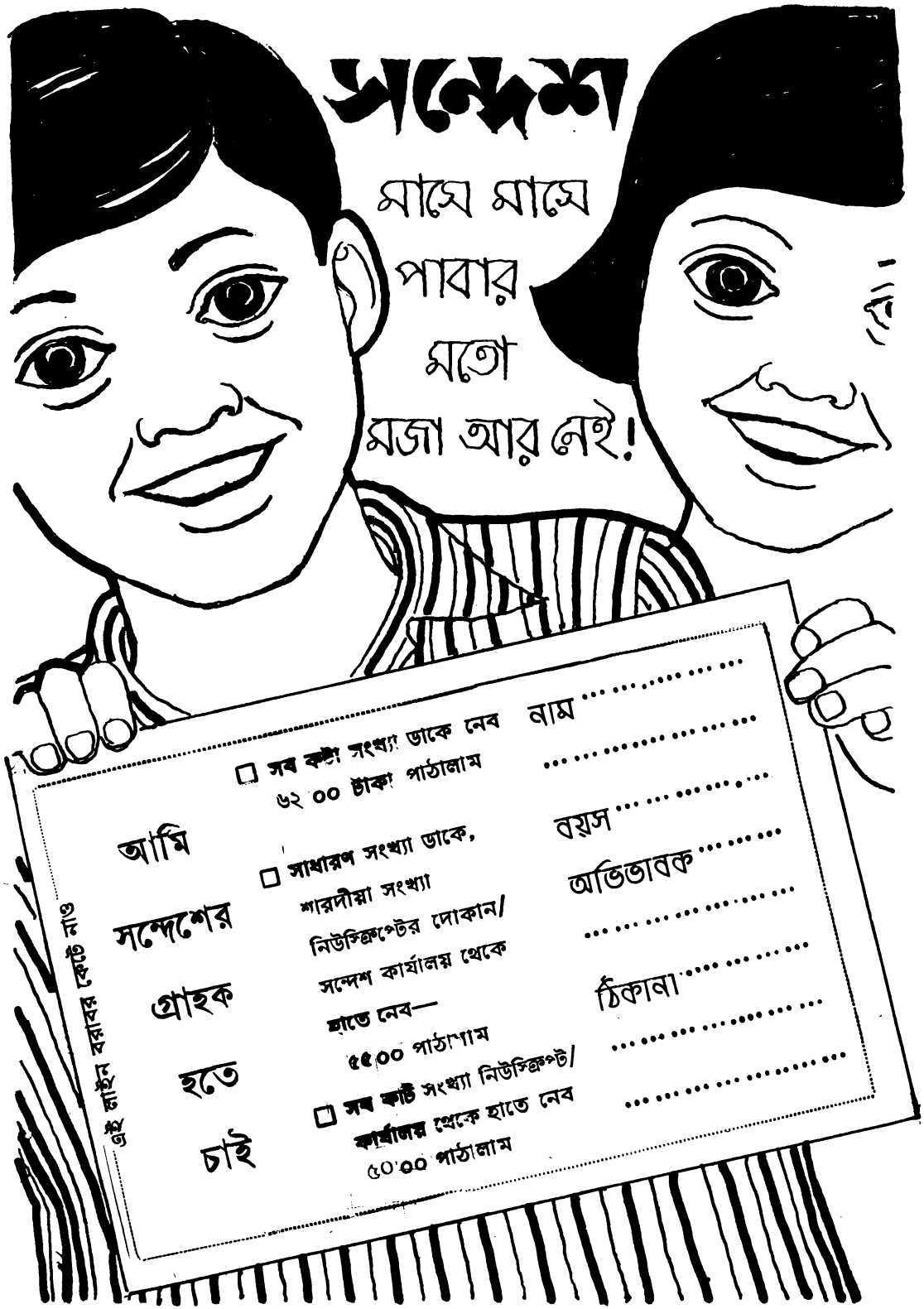

সন্দেশ
মাসে মাসে
পাবার
মতো
মজা আর নেই!
আমি
সন্দেশের
গ্রাহক
হতে
চাই
সব কটা সংখ্যা ডাকে নেব
৬২ ০০ টাকা পাঠালাম
সাধারণ সংখ্যা ডাকে,
শারদীয়া সংখ্যা
নিউজস্ক্রিপ্টের দোকান/
সন্দেশ কার্যালয় থেকে
হাতে নেব—
৫৫০০ পাঠালাম
সব কটি সংখ্যা নিউজস্ক্রিপ্ট/
কার্যালয় থেকে হাতে নেব
৫০'০০ পাঠালাম
নাম
বয়স
অভিভাবক
ঠিকানা

শিশু সাহিত্য সংসদের বই মানেই ছোটদের জগতে হুলুস্থুল হইচই

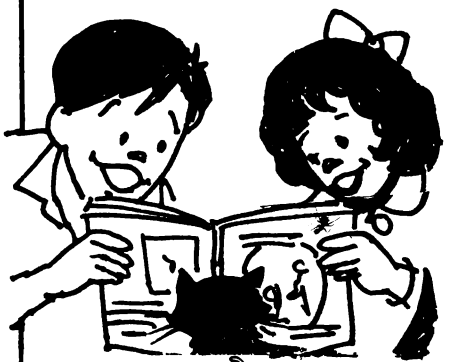

এলো বৈশাখ, বাজে ওই শাঁখ
গেলো দিয়ে ডাক অন্তরে !
প্রাণের পাতায়, খুশির খাতায়
মনকে মাতায় মন্তরে !!
নতুন বর্ষ জাগালো হর্ষ
মাতালো হৃদয় হুল্লোড়ে !
"শিশু সাহিত্য সংসদ" প্রাণে
তৃপ্ত তুফান তুলালো রে !!

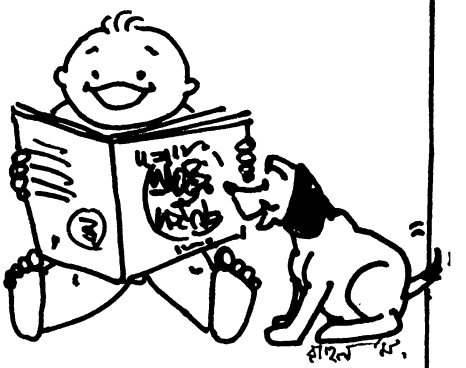

লেখায় : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

রেখায় : রাহুল মজুমদার

দ্রুত পঠনের বই

নীতিমালা-১	৪.৫০
নীতিমালা-২	৫.৫০
ঈশপের গল্প	৭.৫০
আমরা বাঙালী	৭.০০
মহীয়সী মহিলা	৪.৫০
ছোটদের সারদাদেবী	৭.৫০
ছেলেবেলার বিবেকানন্দ	৫.৫০
ছবিতে রামায়ণ (পূর্ণ চক্রবর্তী)	৭.৫০
ছবিতে মহাভারত (পূর্ণ চক্রবর্তী)	৮.০০
ছোটদের রামায়ণ (যোগীন্দ্রনাথ সরকার)	৪.৫০
ছোটদের মহাভারত (যোগীন্দ্রনাথ সরকার)	৮.০০
ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ (শশিভূষণ দাশগুপ্ত)	৭.৫০
ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত (শশিভূষণ দাশগুপ্ত)	৮.০০

শব্দ অর্থ বানান শেখার বই

হাসতে হাসতে বানান (পবিত্র সরকার)	১২.৫০
অর্থ জানো (দেবসেনাপতি)	২৫.০০
বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম (রমেন ভট্টাচার্য)	১০.০০

ইংরেজি হাতের লেখার বই

Samsad English Copy Book-I	6.00
Samsad English Copy Book-II	4.00
Samdad Cursive Writing : 0	7.50
Samsad Cursive Writing : 1	8.00
Samsad Cursive Writing : 2	6.50
Samsad Cursive Writing : 3	6.50
Samsad Cursive Writing : 4	7.50

অঙ্ক শেখার বই

Samsad Number Book	8.00
Easy Maths (Workbook) I	10.00

আঁকা শেখার বই

Samsad Pencil Drawing-1	6.50
Samsad Pencil Drawing-2	6.50
Samsad Pencil Drawing-3	6.50
Samsad Pencil Drawing-4	6.50
Samsad Easy Colouring Book-1	6.00
Samsad Easy Colouring Book-2	4.50
Samsad Easy Colouring Book-3	4.50
Samsad Easy Colouring Book-4	4.50

BRM/SSS/98/1

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৫-৭৬৬৯ এবং ৩৫-৩১৯৫

বৈশাখ ১৩৯৮

মে ১৯৯১

নববর্ষ সংখ্যা

সম্পাদক
লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ
ও
সত্যজিৎ রায়

গল্প—

চালাক শেয়াল / সুবিনয় রায় ৬
গল্প হলেও সত্যি / করুণাময় বসু ৭
মনের কথা কই / লীলা মজুমদার ৯
কথার দাম / সুধাংশুকুমার দত্ত ১২
পিঁপড়ে পিঁপড়ির গল্প / জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত ১৩
আজগুবি জ্ঞান / রেবন্ত গোস্বামী ১৬
রাঙা বাবু / সুচন্দ্রনাথ দাস ১৮
ভগবানের কাছে চিঠি / পলাশবরন পাল ৩৩
ঢোল ভাঙার ভোটবাবু / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৩৩
তেরো নম্বর ঘরের বাসিন্দা / শচীন্দ্রনাথ বসু ৪৩
শাস্তি / সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১

ধারাবাহিক উপন্যাস

লালবন্ঠিয়ার ভয় / সলিল চট্টোপাধ্যায় ২৩

ছড়া ও কবিতা

এক রক্ত একই জল / অতনু বর্মণ ৫
সুখের খোঁজে / গৌতম অধিকারী ১১
সঙ্গে আছি / সুধীন্দ্র সরকার ১২
ইয়েতির ইতিবৃত্ত / ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ১৭
মওকা / সুখেন্দু মজুমদার ৩২
উদো বুধো / অপূর্ব দত্ত ৩২
কলকাতা / বিজন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪
মনে মনে / তাপস রায় চৌধুরী ৪১
ময়না কেন কয় না কথা ? / নন্দিতা দাশগুপ্ত ৭১

প্রবন্ধ

বনের খবর / প্রমদারঞ্জন রায় ৫২
কমিক স্ট্রিপ ন্যাড়া / হিজি বিজ বিজ ২২
কালাচাঁদ ও পাগলা দাশু ৪২
মারাদোনা / শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫
গল্প সল্প / লীলা মজুমদার ৭২
উৎসবের খবর ৬৯
নতুন বছরের চিঠি ৭০

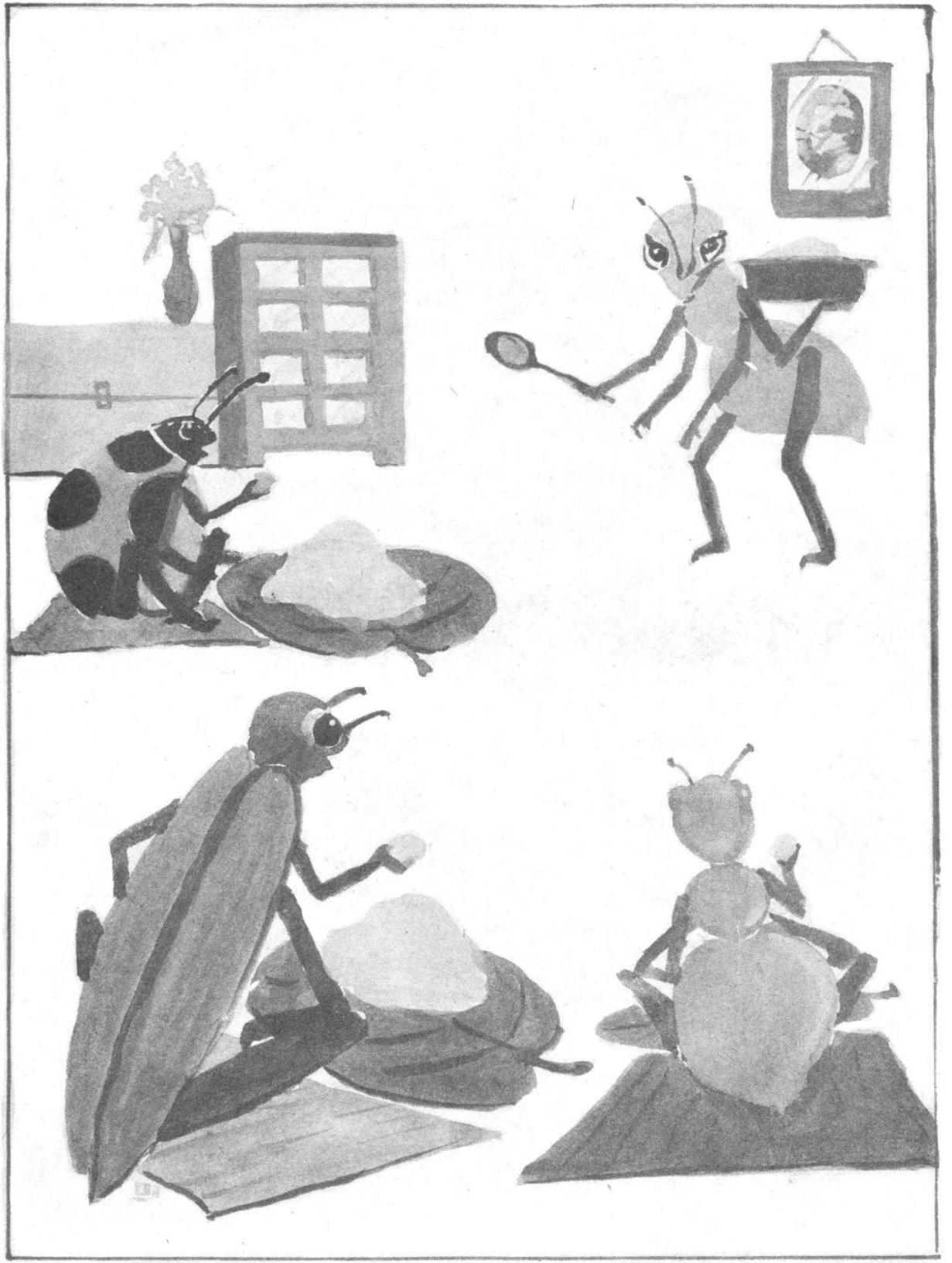

পিঁপড়ে পিঁপড়ির গল্প / জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত

বৈশাখ ১৩৯৮

মে ১৯৯১

এক রক্ত একই জল

অতনু বর্মণ

কঙ্গো ঘানা
ব্রেজিল বেনিন
স্পেন সুইডেন
জিম্বাবুয়ে
বিশ্বজুড়ে
শ্রীরামপুরের
দেখে এলেন
সব মানুষের
নীল আমাজন
নিগার মেকঙ
গঙ্গা আমুর
ভোলগা তিস্তা
ভেলায় চড়ে
বাগবাজারের
দেখে এলেন
সব নদীতে

ইরাক ইরান
নামবিয়া,
জাপান নেপাল
জামবিয়া।
এলেন ঘুরে
ভক্ত পাল,
আজব ব্যাপার
রক্ত লাল।
মিসিসিপি
হোয়াংহু,
পদ্মা তিতাস
ওয়াংচু।
এলেন ঘুরে
নীলোৎপল,
আজব ব্যাপার
একই জল।

চালাক শেয়াল

সুবিনয় রায়

বাগানের গাছে গাছে ফল পেকেছে ; দেখে তো শেয়ালের জিভে জল এল। কিন্তু কি করে বেচারা? বাগানের চারিদিক উঁচু পাঁচিল ঘেরা! ফটকও প্রায় সব সময়ই বন্ধ থাকে। রোজ বেচারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়, হঠাৎ একদিন দেখতে পেল যে পাঁচিলের এক জায়গায় একটা গর্ত ;—বোধ হয় কোন নর্দমা। অমনি সেই গর্তের ভিতর দিয়ে ঢুকতে গেল। কিন্তু বেচারার ভাগ্যে নেই ফল খাওয়া, ঢুকবে কেমন করে? মাথাটা ঢুকিয়ে সামনের পা অনেক কষ্টে ঢুকিয়ে দিল ; তারপর আর ঢোকে না। গর্তটা একটু ছোটই ছিল।

শেয়াল বেচারার তখন বড় দুঃখ হ'লো। আরেকটু রোগা হতে পারলে তো তখনই ভিতরে ঢুকে খেতে পারত। তাই সে প্রতিজ্ঞা করল্ সে দিন কয়েক উপবাস থেকে রোগা হবে, তারপর সেই গর্ত দিয়ে বাগানে ঢুকবে।

যেমনি কথা তেমনি কাজ। কয়েক দিন উপবাসে থেকে তার শরীর একেবারে টিং টিঙে রোগা হয়ে গেল, আর সেই গর্ত দিয়ে সে অনায়াসে বাগানে ঢুকে গেল। তারপর তাকে দেখে কে? মনের সুখে গাছের ফল খায় আর ঘুরে বেড়ায়, কোন লোকজন দেখ্লে তাড়াতাড়ি গাছপালার আড়ালে লুকায়।

শেষটায় একদিন একজন লোক দুটো কুকুর নিয়ে বাগানে থাকতে এল। শেয়াল তো কুকুর দেখেই ভাবল, 'সর্বনাশ! এই বারে তো আমাকে তাড়া করবে! মানে মানে পালানো যাক।'

কিন্তু, যাবে কোথায়! ফল খেয়ে বেচারা এত মোটা হয়েছে সে সেই গর্তে আর তার শরীর ঢোকে না, তখন আর কি করে বেচারা? আবার উপবাস আরম্ভ হলো। এক দিকে পেটে ক্ষিধে, আরেক দিকে কুকুরের ভয় ;—সারাদিন বেচারা একেবারে অস্থির ভাবে কাটাতো। রাত্রেও একটু ঘুম নাই ; পাছে কুকুর আসে। এমনি কষ্টে কয়েক দিন কাটিয়ে শেষটায় সে আবার একটু রোগা হ'লো। তখনই সে ছুটে গিয়ে সেই গর্ত দিয়ে গলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসেই আগে সে নাকে খৎ দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল সে আর কখনও হ্যাংলামি করবে না।

গল্প হলেও সত্যি

করুণাময় বসু

তখন সবে দেশ ভাগ হয়েছে। ছিন্নমূল হিন্দু উদ্বাস্তুর ঢল নেমেছে পূব বাঙলা থেকে ভারতবর্ষের দিকে। যে যেরকমভাবে পারে শেষ সম্বলটুকু নিয়ে সড়ক পথে, নদীতে নৌকোয় চেপে এদেশে চলে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে রাস্তায় ছিনতাই, ধান্দাবাজদের দৌরাত্ম্য, লুঠেরাদের রাজত্ব হয়ে উঠেছে। চারদিকে অরাজকতা। তখনও ভিসা, পাশপোর্ট চালু হয়নি।

এই সময় ফরিদপুরের ভোজপুর গ্রাম থেকে প্রায় সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা একটা টিনের বাক্সে হয়তো তাঁর শেষ সম্বলটুকু আঁকড়ে ধরে পদ্মা পার হয়ে নৌকাযোগে এপারে গোয়ালন্দের ঘাটে এসে নামছেন। এখান থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদহ যাবেন। ছেলের বাড়ি কলকাতায়, আহিরীটোলায়। ভোজপুর গ্রাম ক্ষুদ্র হলেও অখ্যাত নয়। এখানে খুব বড়ো মাপের এক ফুটবলারের জন্মভূমি বলে অনেকে ভোজপুর গ্রামের নাম এক ডাকে চেনে।

গোয়ালন্দের ঘাটে নামতেই বৃদ্ধাকে একদল পুলিশও কাস্টমসের লোক ছেঁকে ধরল। কাস্টমস ইনসপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'ও বুড়ি, তোমার টিনের বাক্সে কি আছে?'

লোকজন দেখে বুড়ি ভয় পেয়ে বললেন, 'কিছু নেই বাবা, কখানা কাপড়, কিছু বাসনকোসন, দু'একটা শিশিতে আচার, এই আছে।'

তারা বৃদ্ধার কথায় বিশ্বাস না করে বাক্স খুলতে বললে। হকচকিয়ে প্রথমে বৃদ্ধা চাবি খুঁজে পাননি। পরে বাক্স খুলতেই দেখা গেল কাস্টমস ইনসপেক্টর বাক্সে উঁকি মেরেই চমকে উঠলেন। তার গলায় স্বর কেমন পাল্টে গেল। একখানা ফটোগ্রাফ দেখেই তাঁর এই ভাবান্তর। মোহনবাগানের ফুটবল ইউনিফর্ম গায়ে এক চওড়া বুক তরুণ যুবকের ছবি।

তিনি সম্ভ্রমের সুরে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বুড়িমা, এ ছবি কার? ইনি আপনার কে হন?'

'কে আবার? এ আমার পোলার ছবি।' পুব বাঙলায় পোলা মানে ছেলে।

'ইনি কি করেন বুড়িমা?'

'কি আর করবে? সারাজীবন ফুটবলে লাথি মেরে গেল।'

ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, 'থাক, আর দরকার নেই। চলুন, আমি আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।'

বৃদ্ধাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তাঁকে একটা জানলার ধারে বসিয়ে দিলেন। শিয়ালদহের একখানা টিকিট কিনে এনে বৃদ্ধাকে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখুন।'

তারপর বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার পোলাকে আমার আদাব দেবেন। তাঁকে বলবেন, কলকাতায় তাঁর খেলা বহু দেখেছি।'

বৃদ্ধা নিশ্চয় তাঁর পোলা গোষ্ঠ পালের গৌরবে গর্ব অনুভব করেছিলেন।

এই ঘটনার সঙ্গে আর একটু সংযোজন করে এই গল্প শেষ করব। আমাদের মত যাঁরা সেকালের কীর্তিমান খেলোয়াড়দের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁরা বলবেন, একালের খেলা, ভালো, খুবই ভালো। কেমন টিমওয়ার্ক, সায়েন্টিফিক গেম। ব্যাক, হাফ ব্যাক, ফরোয়ার্ডের নাম পালটে স্টপার, মিড ফিল্ডার, স্ট্রাইকার নাম রাখা হয়েছে, সবই ঠিক। তবে সেকালে গোষ্ঠ পাল, কুমার, সামাদ, ছোনে মজুমদার, সতু চৌধুরীদের একক ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের যে জৌলুস খেলায় দেখেছি, এখনকার খেলায় সে জৌলুস আর দেখলাম কই? দর্শকদের সেই ময়দান কাঁপানো আত্মহারা উল্লাসের ধ্বনি এখনো কানে বাজে।

করুণাময় বসু

সন্দেশের আরো একটি পরম বন্ধু চলে গেলেন। টাকী নিবাসী কবি করুণাময় বসু দীর্ঘকাল ধরে সন্দেশে লিখে পাঠক, লেখক সবার কাছেই প্রিয় হয়েছিলেন। জন্ম ২১ / ১২ / ১৯০৭, মৃত্যু ২২ / ১ / ১৯৯১। প্রধানতঃ কবি হলেও করুণাময় অনেকগুলি চমৎকার গল্প লিখেছেন। সন্দেশ যেমন তাঁকে ভালবাসত, তিনিও সন্দেশকে ভালবেসে প্রতি বছর অনেকগুলি লেখা উপহার দিয়েছেন। সেগুলি আমরা সাগ্রহে ছেপেছি। এখনও পর্যন্ত কিছু লেখা জমা আছে, ক্রমে ছাপা হবে।

মনের কথা কই

লীলা মজুমদার

হ্যাঁরে, ওরে সন্দেশীরা তোরা কত রকম ফলের কথা জানিস্ বল তো দেখি? এক তো জানিস্ পরীক্ষার ফল। বৈশাখে তাই নিয়ে নাই বা মাথা ঘামালি। তবু ওই পরীক্ষার ফল বলতেই মনে পড়ল অঙ্কের ফল। ঐ যে বারে বারে প্যাঁচালো আঁকটা কষছিস্ আর একেক বার একেক রকম ফল পাচ্ছিস্ তবেই বুঝবি আঁকটি বেবাক ভুল। আর যদি সর্বদা একই উত্তর পাচ্ছিস, তাহলে হয় অঙ্ক ঠিক, নয় তুই একটা গাধা! এই দুটোর একটা না হয়ে যায় না।

আরেক রকম ফল হল গিয়ে কর্মফল। সেটাকে আর কামড়ে খাবার চেষ্টা করে কাজ নেই। নিজের বিচারবুদ্ধি মতো কাজ করে যা আর যা হবার তা হক গে ছাই! তবেই বুঝব মানুষের মতো মানুষ হয়েছিস্।

আরো আছে যথা রাশীফল। অনেকে মনে করে যে তাই দিয়েই তোদের ভাগ্য কি আছে তা ঠিক হয়ে যায়। তোদের তার ওপর কোনো হাত নেই! কবে, কোন সময়ে, কোন লগ্নে জন্মেছিলি, তাই দিয়ে সারা জীবন কি হবে না হবে ঠিক হয়ে যায়। কোনো মতেই তা ঠেকানো যাবে না, তা যতই না মাদুলী পরিস্, মন্ত্র নিস্। ভাবি তা হলে মানুষেতে আর কেঁচোতে খুব একটা তফাৎ নেই। মোট কথা গল্প শুনেছি আমার এক আত্মীয়ার জন্মের সময়ে তার দাদামশাই পঞ্জিকা হাতে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছিলেন। সবাইকে ধমক দিচ্ছিলেন এখন জন্মানো চলবে না। যেমন করে পার সময়টা আধঘন্টা পেছিয়ে দাও। তাহলে ছেলে হলে রাজা হবে, মেয়ে হলে রাজরাণী হবে।' দুঃখের বিষয়, জন্ম পিছিয়ে দেবার নিয়ম কারো জানা না থাকাতে, যথা সময় একটি কন্যা জন্মাল। এবং তোমরা শুনে খুশি হবে যে রাজরানী না হলেও সে তার কর্মক্ষেত্রে যশস্বিনী হয়েছিল।

সে যাই হক গে, ফলের বিচিত্র মানের কথা ভেবে আমি অবাক হই। পরিণামকেও বলে 'ফল।' লোকে বলে এত চেষ্টা করলাম তবু কোনো 'ফল' হল না। এক কালে আমিও অঙ্কের 'ফল' নিয়ে খব মাথা ঘামাতাম। জানতাম সেটার ওপরেই পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। নব্বুইয়ের কম নম্বর পেলে, কান্না পেত। এখন আমি কেয়ার করি না। ভাবি ও আবার কেমন ধারা এক ঘেঁয়ে জিনিস যে-কেউ, যে-কোনো সময়ে যে কোনো দেশে, যে-কোনো অঙ্ক ঠিক করে কষে তার সর্বদা-ই একই উত্তর হবে। ভাব্ একবার! কাল্পনিকতার শ্রাদ্ধ!!

ও-সব ছেড়ে বরং সব চাইতে ভালো ফলের কথায় আসা যাক। না, না, আকাশচারীদের সাফল্যের কথা বলছি না। কিম্বা দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে যারা সফল হয়, তাদের জীবন সার্থক হতে পারে, কিন্তু আমি যে ফলের কথা ভাবছি সেগুলোকে মুখ্যুরাও চুষে, চিবিয়ে, কামড়িয়ে, কিম্বা গিলে খেতে পারে। তার জন্য আগের থেকে রাত জেগে পড়া তৈরি করতেও হয় না। বিশ্বাস কর ছাগলরাও সে ফল খেয়ে কৃতার্থ হয়ে ব্যা—ব্যা শব্দে আনন্দ জানায়।

আর শুধু ছাগল কেন, আমার নিজের জীবনের একেবারে প্রথম দিককার প্রথম স্মৃতি হল আমার আড়াই বছর বয়সের। শিলং শহরের লাবান পাহাড়ে একটা বাড়িতে আমরা সদ্য উঠে এসেছি। বাবা অফিসে; মা জিনিসপত্র গুছোচ্ছেন। দাদা একটা ঝোপে সুন্দর লাল ফল থোপা থোপা গজিয়ে থাকতে দেখে একটা খুদে ফল তুলে মুখে দিল। তাই দেখে দিদিও একটা

দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনার মুখ দিয়ে শাদা ফেনা বেরোতে লাগল। দাদা বলল, 'ওগুলো বিষ ফল, আমরা মরে যাব।' বলে শুয়ে পড়ল। তখন আমি আর ছোট ভাই এমনি হাউ-মাউ কান্না লাগালাম যে মা আর আমাদের কাজের লোক কাকমি-উবিন ছুটে এল। কাকমি-উবিন বলল, 'ওগুলো বিষ ফল। ভয় নেই ওর ওষুধ আনছি।' এই বলে ছুটে ঘরে গিয়ে এক ঠোঙা নুন এনে দুজনার মুখে ঠুসে দিল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে বমি করল, ফেনা ওঠা বন্ধ হল। সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আমরা সবাই বিষ ফল চিনে রাখলাম। পরে শুনেছি ওতে ফেণাই বেরোয়, কেউ মরে না। তোরাও শিখে রাখ্, অচেনা জিনিস মুখে দিস না।

ফলের দেশ শিলং-এর ঐ বিষ-ফল ছাড়া দশ বছর ধরে কত না অপূর্ব সব ফল খেয়েছি, তার কথা না বলে পারছি না। লাবান পাহাড়ে অল্প দিনই ছিলাম। তারপর সুমগারিং-এর পাহাড়ি নদীর ধারে-উইণ্ডস্ বাড়িতে অনেক বছর কাটিয়েছি। বাড়িটা ছিল একটা ফলের বাগান! আজ তার কথা বলি শোন।

আস্তাবলের পিছনে কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে সুম্পারিং নদীর ধারে আমাদের তুঁতফলের গাছটি একা দাঁড়িয়ে থাকত। গাছ ভরা রেশম-কীটের গুটি পাতার আড়ালে বছরের বিশেষ সময়ে দেখতে পেতাম আর দেড়-ইঞ্চি লম্বা গাঢ়-লাল, মধুর মতো মিষ্টি ফলগুলে ঝুলে থাকত! ইংরিজি নাম মাল্‌বেরি।

নদীর ধার থেকে উঠতে শুরু করলে, প্রথমেই বেয়ারাদের গুদোমের সারি, আস্তাবল। তার পাশে ঘোড়া নিমের গাছ। তার ফুল বেগুনি, সুগন্ধী, ফল বিষ তেতো। বোধ হয় ওষুধ হয়। তারপর আমাদের আলু-ক্ষেত আর তরি-তরকারির বাগান। তারপর পীচ গাছ আর প্লাম গাছ। ফল পাকলে সুগন্ধে মো-মো আর তেমন চোখে দেখলাম না। সেরা বিদেশী টিনে মাঝে মাঝে গন্ধটুকু লেগে থাকে।

ঢাল বেয়ে আরেকটু উঠলেই ছিল আমাদের ন্যাসপাতি গাছের মেলা। খুদে খুদে বুনো

ন্যাসপাতি দাঁড়কাক আর বাদুড় ছাড়া কেউ খায় না। লম্বাটে স্টার অ্যাপ্‌ল্‌; কামড়ে খেলে কষা মতো; গরম ছাইতে পুড়িয়ে খেলে যেমনি স্বাদ, তেমনি গন্ধ। ওর কথাও বাদ।

তার পরে পাঁচটা তুলনাহীন ন্যাসপাতির গাছ। বইতে দেখি ন্যাসপাতিকে নাকি ইংরিজিতে 'পেয়ার' বলে, PEAR। কলকাতায় তাও খেয়েছি, লম্বাটে, ডুমুরের আকার, পাকলে নরম শাঁস। আমাদের বাড়ির ন্যাসপাতি লম্বাটে কিন্তু পুরুষ্টু! পাকলে সোনালি রং ধরে; রসাল; চিবুলে একটু কচ্‌ কচ্‌ করলেও, তার তুলনা হয় না। পাকলে একেকটা আপনা থেকে ঝুপ্‌ করে খসে পড়ত। আমরা ভোরে গিয়ে তুলে আনতাম। মনে হত সূর্য ওঠা আজ সার্থক হয়েছে।

আর কি গাছ ছিল? বুনো লেবুর একটা, মিষ্টি লেবুর একটা, গন্ধ লেবুর পাশাপাশি তিনটি গাছ। আহা! শৈশব তো নয়, যেন স্বর্গ বাস!

মাঝে মাঝে আকাশের দিকে ছুটীর দিনে পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম। শীতের আগে ঝোপে ঝোপে বেরি BERRY পেকে থাকত, রাস্‌প্‌-বেরি, ঘাসের মধ্যে বুনো স্ট্রবেরি। শেষেরটা দেখতে সুন্দর, খেতে পান্‌সে। অন্যগুলো যেমনি দেখতে, তেমনি মিষ্টি আর সুগন্ধী। তবে সঙ্গে সঙ্গে তুলে না ফেললেই পোকা ধরে যেত। তারাও তো খাবেদাবে; নইলে প্রজাপতি হবে কি করে?

সেই ফুল, ফল, প্রজাপতি, কুদুপাখি আর ছোট নদী—সব মিলে আমার মনে যে নন্দন কানন তৈরি করে রেখেছে, সেখানে বয়স্ক কারো প্রবেশ নিষেধ সন্দেশীদের কাছে নয়। তাদের সব মনের কথা খুলে বলা যায়।

সুখের খোঁজে

গৌতম অধিকারী

ঘর পেরোলেই পথের ধুলো পথ পেরোলেই মাঠ,
একমুঠো সুখ খুঁজে বেড়াই চূর্ণী নদীর ঘাট।
জল টলটল ছোট্ট নদী সবুজ ঢাকা পাড়,
ডাক দিয়ে কয়, সুখ পেতে যা স্বপন পুরীর পাড়।
ভাবছি কোথায় স্বপনপুরী নাম শুনিনি হায়,
মৌটুসী এক পাখি বলে পথ চেনাবো আয়।
দেখায় পাখি ছোট্ট নাওয়ে জোনাক জ্বালে দীপ,
হাল ধরে এক ছোট্ট মেয়ে কপালে লাল টিপ।
একমাথা চুল কোঁকড়া কোঁকড়া মুখে খুশীর জয়,
নৌকাতে যেই উঠতে গেছি সেই মেয়েটা কয়,
প্রীতির রাখী ছিঁড়ে মিছেই সুখের কর খোঁজ,
পাবে নাতো যতই খোঁজ ঘুরতে হবে রোজ।
কোথায় পাবে সুখকে তোমার? সুখ করেছে মান,
ঘরেই পাবে গাও যদি ফের ভালবাসার গান।

কথার দাম

সুধাংশুকুমার দত্ত

আমরা তো কতজনকেই না কত কথা দিই, কিন্তু অনেক সময় সামান্য সামান্য অছিলায় সেই কথা রাখতে পারি না, অথচ সেজন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হই না! কিন্তু এমন মানুষও ছিলেন, যিনি তাঁর জীবনের এক চরম দুঃখের মুহূর্তেও কথা রক্ষায় কুণ্ঠিত হননি!

ঘটনাটা অনেক বছর আগেকার। একজন বিখ্যাত কবি দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পরিবারে নিমন্ত্রিত হন এবং যথা সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।

নির্দিষ্ট দিনে সেই অভিজাত পরিবারের গৃহকর্ত্রী যথাযোগ্য আয়োজন করে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই নিমন্ত্রিত অতিথির জন্যে। কিন্তু অপরাহ্ণ শেষ হয়ে গেল, সন্ধ্যাও হল অতিক্রান্ত, অথচ তাঁর দেখা নেই! এমন কি, ক্রমে রাত প্রায় দশটা বাজতে চলল। কিন্তু হঠাৎ বাড়ির সামনে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল, গাড়িটি সেই বাড়ির সদর দরজার সামনেই দাঁড়াল। গৃহকর্ত্রী দরজা খুলতেই সবিস্ময়ে দেখলেন, গাড়ি থেকে ধীর পায়ে নামলেন সেই অতিথি, যাঁর জন্যে তিনি এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন! কিছু প্রশ্ন করার আগেই সেই অতিথি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বেলি আজ চলে গেল, তাই দেরি হয়ে গেল!' গৃহকর্ত্রীর মনে পড়ল ভদ্রলোকের কন্যার নাম 'বেলি' অর্থাৎ বেলা, যিনি কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। এখন বুঝলেন তিনি পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু কন্যার বিয়োগ ব্যথায় বিধুর শোকার্ত পিতা তা সত্ত্বেও কথা রক্ষা করতে উপস্থিত হয়েছেন সেই দিনই। একি স্বপ্ন না সত্যি?

এদিকে সেই ভদ্রলোক ঐ ক'টি কথা বলেই যেমন ধীর পায়ে এসেছিলেন, তেমনি ধীর পায়ে আবার অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে চলে গেলেন! গৃহকর্ত্রী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন!

এই অপরূপ কথা রক্ষার কাহিনী আজ কিংবদন্তী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গল্প হলেও এই কাহিনী সত্যি এবং ঐ সত্যসন্ধ ভদ্রলোকটি আর কেউ নন, উনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর পরম আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (ডাক নাম বেলা বা বেলি) মৃত্যুর দিনেও কথা রক্ষা করতে গভীর রাত্রেও ঐ ভদ্রমহিলার বাড়ি উপস্থিত হয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ কর্ত্রী ভদ্রমহিলা ছিলেন রানু অধিকারীর জননী শ্রীমতী সরযুবালা অধিকারী এই রানু অধিকারীই পরবর্তী সময়ে লেডী রানু মুখোপাধ্যায় নামে বিখ্যাত হয়েছেন।

সঙ্গে আছি

সুধীন্দ্র সরকার

তিরিশ বছর অনেক কটা দিন।
স্মৃতির পাতায় যে-সব কথা—
হচ্ছে ক্রমে ক্ষীণ!
তাদের কী চাও ফিরে পেতে,
ছোট্ট বেলায় হারিয়ে যেতে?
এসো তবে আমার সাথে,
সন্দেশীদের আসরটাতে;
এই দেখনা আজও যে তার—
পতাকা উড্ডীন!
তিরিশ বছর অনেক কটা দিন।
বাবা-মায়ের ছোট্টবেলায়
যেমনি ছিল ও,
আজও ঠিকই তেমনি আছে—
নেই তায় সন্দেহ!
তিরিশ বছর আগের লেখা
এবং যেটা সদ্য,
গল্প, ছড়া, উপন্যাসে
মধুর অনবদ্য।
হাসি-খুশির হার্টটি এমন,
পাবে কী আর কোথাও তেমন?
তিনপুরুষের পরিশ্রম, আজ—
হয় না যেন লীন!
সন্দেশীরা সঙ্গে আছি—
বাঁচবো-গো যদ্দিন।

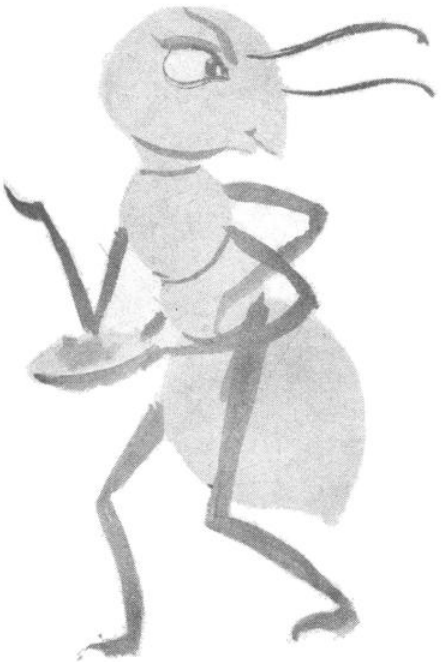

পিঁপড়ে পিঁপড়ির গল্প

জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত

এক পিঁপড়ে ছিল আর এক পিঁপড়ি। পিঁপড়ে বড়ো অলস, পিঁপড়ি খুব কাজের। কাছেই এক গ্রাম—তারি পাশে ছিল বন। ঐ বনের একটা শিমুল গাছের ডালের কোটরের মধ্যে পিঁপড়ে পিঁপড়ি থাকে। পিঁপড়ে খেতে খুব ভালোবাসে—আর পিঁপড়ি রাঁধতে।

সূর্য উঠলে গাছের মাথায় মাথায় আলো ছড়িয়ে পড়ে। গাছের তলাতে থাকে কোথাও হাল্কা ছায়া, কোথাও গাঢ়। সন্ধে হলেই সব নিঝুম—অন্ধকার।

পিঁপড়ি ভালো রাঁধে। লতার ডগা, গাছের কচি পাতা, ছোট ছোট আমলকি আর তেঁতুল দিয়ে রান্না করে। আর পিঁপড়ে খায়, তারিফ করে। পিঁপড়ির বুক ফুলে উঠে, আরও ভালো করে রান্না করে, পিঁপড়ে আরও তারিফ করে।

গরমের পর এল বর্ষা। তারপর শীত। গাছের শুকনো পাতা গেঁথে পিঁপড়ি লেপ বানালো। পাতার লেপ গায়ে দিয়ে গাছের কোটরে পিঁপড়ে ঘুমোয়, পিঁপড়ি ঘুমোয়।

শীতের সকাল। পিঁপড়ে ঘুমোচ্ছে। পিঁপড়ি ঘুম থেকে উঠে ভাবছে কি খাওয়া হবে, কি রান্না করবে। পিঁপড়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—'পিঁপড়ে কুমড়োর ফুল রাঁধবো?' পিঁপড়ে চোখ মেললো। বল্লে, পিঁপড়ি খিচুড়ি খাব—এমন শীত—খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে।'

পিঁপড়ি বল্লে—'ওমা, খিচুড়িত মানুষে খায়। ওতেত শুনেছি চাল ডাল লাগে—ওসব আমি কোথায় পাব?' পিঁপড়ে চুপ করে রইল।

পিঁপড়ি কুমড়ো ফুলের ঘন্ট রান্না করলো—পিঁপড়ে কুমড়ো ফুল ভালবাসে। রান্না হবার পর পিঁপড়েকে ডাকলো—পিঁপড়ে খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলো—'খিচুড়ি রান্না করনি?' পিঁপড়ি বল্লে,'খিচুড়িত মানুষে খায়—লক্ষ্মীটি, কুমড়োর ফুল রেঁধেছি। তাই তুমি খাও।' পিঁপড়ে মুখ ভার করে কুমড়োর ফুলের ঘন্ট খেল। পিঁপড়ি জিজ্ঞাসা করলো—'খেয়ে ভাল বললে নাত!' পিঁপড়ে বললে—'ভালোইত!'

পিঁপড়ি ভাবনায় পড়লো। পিঁপড়ে খিচুড়ি খেতে চাইছে—কিন্তু চালডাল সে পাবে কোথায়!

পিঁপড়ি মুখ খুলে পিঁপড়েকে বলতে পারে না—তাহলে চাল ডাল এনে দাও, আমি রান্না করি। পিঁপড়ি জানে—পিঁপড়ে কোন কাজের নয়—

পিঁপড়ে ডুমুরের তরকারি রান্না করে—তেঁতুলের টক।

পিঁপড়ে চুপ করে বসে খায়—ভালোমন্দ কিছু বলে না। খাওয়া শেষ হলে চুপ করে উঠে চলে যায়। মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করে, 'পিঁপড়ি খিচুড়ি রাঁধবে কবে—খিচুড়ি খাব কবে?'

পিঁপড়ে পিঁপড়ির এক প্রাণের বন্ধু উচ্চিড়িঙ্গে। পিঁপড়ে পিঁপড়ি ছোট, উচ্চিড়িঙ্গে দেখতে বড়ো। হাসিখুশি, চতুর আর খুব কাজের। সে নিজের কাজ করে, অন্যদের কাজও করে। চুপ করে বসে থাকবার তার সময় কোথায়!

উচ্চিড়িঙ্গেকে দেখে পিঁপড়ি খুশি হল—একটু আশার আলো দেখতে পেল—কিন্তু কোন কথা বল্লে না। উচ্চিড়িঙ্গের মনে হল—কিছু যেন হয়েছে। পিঁপড়ি বল্লে—'জানো উচ্চিড়িঙ্গে, পিঁপড়ে কি অবুঝ! সে জিদ ধরেছে—খিচুড়ি খাবে। আমি চাল ডাল কোথায় পাব? খিচুড়িত মানুষেরা খায়। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো না।' উচ্চিড়িঙ্গে—'ও এই। আমি যদি চাল ডালের ব্যবস্থা করি তুমি রাঁধতে পারবে ত?'

এক গাল হেসে পিঁপড়ি বললে—'পারব বৈকি, নিশ্চয় পারব। উচ্চিড়িঙ্গে সত্যি তুমি চাল ডাল আনতে পারবে?' উচ্চিড়িঙ্গে 'দেখি'বলে লাফাতে লাফাতে উড়তে উড়তে চলে গেল।

বনে কত গাছ—কত রকমের ফল। একটা গাছ—তাতে ছোট ছোট অনেক ফল ঝুলছে—লাল টুকটুকে পাকা টসটস—খেতে মিষ্টি, চিনির থেকেও মিষ্টি।

উচ্চিড়িঙ্গে সে ফলের কথা জানে—মানুষ জানে না।

একটা বড় বটপাতা আর ঐ গাছের দুটো ফল নিয়ে লাফাতে লাফাতে, উড়তে উড়তে উচ্চিড়িঙ্গে গ্রামে গেল। একটা মুদির দোকান—চাল ডাল আলু পেঁয়াজ নুন-সব আছে। দোকানদার আর তার ছোট ছেলে দোকানে বসে আছে। সবে দোকান খুলেছে, যারা জিনিস কিনবে তারা তখনও কেউ আসেনি। উচ্চিড়িঙ্গে এসে টুপ করে ফল দুটো দোকানে মেঝের উপর ফেলে দিল। ছেলেটা একটা ফল কুড়িয়ে তা মুখে দিল, কী ভালো, কী মিষ্টি। উচ্চিড়িঙ্গে বলে উঠলো, 'ও কি, আমার ফল খাচ্ছ কেন? আমি নিজে খাবার জন্য পেড়ে এনেছি, দাও, ফিরিয়ে দাও আমার ফল।' ছোট ছেলেটি বললে, 'না আমি দেব না, আমি খাব।'

দোকানদার ভালো মানুষ, সে পড়ল বেগতিকে। উচ্চিড়িঙ্গেকে বললে, 'উচ্চিড়িঙ্গে, ও ছোট, খেতে চাইছে, দাওনা ওকে খেতে।'

উচ্চিড়িঙ্গে বললে, 'বেশ, তাহলে তুমি আমাকে চাল ডাল নুন দাও, আর ছোট একটা পেঁয়াজ' দোকানদার ব্যস্ত হয়ে বললে, 'দিচ্ছি দিচ্ছি। কার জন্য নিচ্ছ, তোমার জন্য বুঝি!' 'না আমার জন্য কেন হবে, পিঁপড়ির জন্য। সে খিচুড়ি রান্না করবে, পিঁপড়েকে খাওয়াবে।' দোকানদার তাকে চাল ডাল নুন দিল, খুব ছোট্ট একটা পেঁয়াজও দিল। একটা পাতায় মুড়িয়ে উচ্চিড়িঙ্গেকে দিল, সে মুখে করে লাফাতে লাফাতে উড়তে উড়তে গিয়ে পিঁপড়ে পিঁপড়ির বাড়িতে হাজির।

পিঁপড়ি চুপ করে বসে ছিল, উচ্চিড়িঙ্গেদার উপর ওদের অগাধ বিশ্বাস। পিঁপড়ি ভাবে, উচ্চিড়িঙ্গেদাকে খেতে বলতে হবে, সে এত ভালো, এত বন্ধু।

উচ্চিড়িঙ্গে চাল ডাল নুন ও পেঁয়াজ নিয়ে এসেছে। 'নাও এবার তোফা করে রাঁধো দিকিনি! বলে দিচ্ছি আমিও কিন্তু খাব। কতদিন তোমার, হাতের রান্না খাইনি।' পিঁপড়ি বললে, 'খাবেই ত, সেত জানাই কথা। কতদিন তুমি এখানে খাওনি। আমি চটাপট রান্না করে দিচ্ছি, দ্যাখো না। তুমি পিঁপড়ের সঙ্গে বসে একটু গল্প কর, কিন্তু খবরদার ওকে বলোনা খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আমি ওকে অবাক করে দেব।' উচ্চিড়িঙ্গে হাসলো, বললে, 'না বলব না। তবে কি জানো, আমার পেটে কথা থাকে না। আমি বরং একটু ঘুরেই আসি।' খাবার আগে উচ্চিড়িঙ্গে

বললে, 'আমার বন্ধু, তোমাদের বন্ধু গুবরে পোকা আছে। খেতে খুব ভালোবাসে। ওকে নিয়ে আসব ? তোমার রান্না অনেকদিন খায়নি, সেদিন সে বলছিল।' পিঁপড়ি বললে 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে এসো, গুবরেপোকাকে কতদিন দেখিনি।'

লাফাতে লাফাতে উড়তে উড়তে উচ্চিড়িঙ্গে চলে গেল। পিঁপড়ি রান্না করতে গেলো, আজ তার মনটা ভালো, রান্নার আনন্দ অনেকদিন সে পায়নি, যেদিন থেকে পিঁপড়ে জিদ ধরেছে খিচুড়ি খাবে।

তখন বেশ বেলা, পিঁপড়ির রান্না শেষ হয়েছে। পিঁপড়ি পিঁপড়েকে ডাকলো, 'পিঁপড়ে খেতে এসো' পিঁপড়ে বললে, 'আমার শরীর ভালো নেই, আমি খাব না।' পিঁপড়ি বুঝলো, 'পিঁপড়ের রাগ হয়েছে।' সে কিছু বলল না।

উচ্চিড়িঙ্গে এল, গুবরেপোকা এল। পিঁপড়ি বললে 'এসো গুবরে পোকা এস।' উচ্চিড়িঙ্গে বললে, 'রান্না হয়েছে পিঁপড়ি ?' পিঁপড়ি বললে, 'হ্যাঁ তোমরা বস, পিঁপড়েকে ডেকে এনে বসাও।' ওরা তাড়াতাড়ি পিঁপড়েকে ডাকতে গেল। পিঁপড়ে উচ্চিড়িঙ্গে গুবরে পোকাকে দেখে খুশি হল। ওরা বললে, 'পিঁপড়ে তোমার সঙ্গে আজ আমরা খাব। চলো।' পিঁপড়ে বললে, 'খাবে বৈকি' মনে মনে ভয় হল, পিঁপড়ে ভাবিত হল, খাবার কম হবে নাত !

ওরা খেতে বসেছে। পিঁপড়ি প্রথমে নিয়ে এল, বকফুলের তরকারি। পিঁপড়ে ভদ্রতা করে বললে, 'খাও ভাই খাও, বকফুলের তরকারি ভালো জিনিস।' পিঁপড়ি উচ্চিড়িঙ্গে গুবরে পোকা মুখ টিপে টিপে হাসে। পিঁপড়ি বললে, 'আরেকটা জিনিস রেঁধেছি, তোমাদের ভালো লাগবে পিঁপড়েও খুব ভালো বাসে।' পিঁপড়ে বললে, 'কি কি ? খিচুড়ি নাকি ?' পিঁপড়ি হাসতে হাসতে সবার আগে পিঁপড়ের পাতেই খিচুড়ি দিল। পিঁপড়ে শুধু একবার পিঁপড়ির দিকে তাকিয়ে বসলে, পিঁপড়ি তারপর খেতে আরম্ভ করলো। উচ্চিড়িঙ্গে গুবরে পোকা খাচ্ছে। খিচুড়িত নয়, অমৃত, পিঁপড়ির সোনা হাতের রান্না—হবেই ত। এক নিঃশ্বাসে অনেকটা করে খিচুড়ি ওরা খেল।

পিঁপড়ে পিঁপড়ি উচ্চিড়িঙ্গেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'খিচুড়ি কেমন লাগল ?' 'তোফা, তোফা, এমন রান্না আর কখনও খাইনি।' পিঁপড়ে পিঁপড়ির দিকে তাকালো। উচ্চিড়িঙ্গে বললে, 'পিঁপড়ির রান্না, হবেই ত।' পিঁপড়ি লজ্জা পেল। বললে, 'চাল ডাল কোত্থেকে এল, কে আনলো, জিজ্ঞাসা করলে না !' উচ্চিড়িঙ্গে অপ্রতিভ হল, 'না না ও আবার কি কথা, তোমরা আমার বন্ধু, আর আমরাওত খেলাম।' গুবরে পোকা, চুপ করে বসেছিল। বলল, 'পিঁপড়ি ভালো, সে এমন ভালো রান্না করেছে, উচ্চিড়িঙ্গে ভালো, সে চাল ডাল এনেছে। আর আমিত শুধু খেলাম।' পিঁপড়ে পিঁপড়ি বলে উঠলো, 'ও কথা বল না ভাই তুমি এসে খেয়েছ। এত আমাদের ভাগ্যের কথা ! তুমি ভালো, খুব ভালো।' পিঁপড়ে বললে, 'তোমরা আমার কথা কিছু বললে না। আমার কথা আমিই বলছি। আমি ভালো, আমি খিচুড়ি খাব খাব না করলে কি এই যোগাড়যন্ত্র, এমন রান্না হত ?' উচ্চিড়িঙ্গে গুবরে বলে উঠল, 'জয় পিঁপড়ের জয়, জয় পিঁপড়ির জয়,' পিঁপড়ে পিঁপড়ি বলে উঠল, 'জয় উচ্চিড়িঙ্গের জয়। জয় গুবরে পোকার জয়।'

আজগুবি জ্ঞান

রেবন্ত গোস্বামী

এক কাপ চা সামনে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা সুমন্ত বাবু টেবিলে জুৎ হয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। সম্পাদকের চিঠি আজই পেলেন। লিখেছেন, 'এবার কিন্তু পূজো অনেক আগে। আর ছড়া কবিতা দিলে চলবে না। এবার একটা জব্বর'—।

এই হল মুশকিল, সুমন্তবাবু নিজের মনে হাসলেন। সিনেমাতে যেমন যে অভিনেতা ভিলেন হয়ে নাম করলেন, তার ভাগ্যে আর অন্য ভূমিকা জোটে না। লেখকদেরও তাই। হাসির গল্প লিখে কেউ একটু নাম করলেন তো সকলেরই চাহিদা তখন সেই হাসির গল্প। এতে লেখকের যে কাঁদো কাঁদো অবস্থা হয়, তা সম্পাদক থেকে পাঠক কেউ বোঝে না। যেমন, নীহারবাবুর ভাগ্যে ভূতের গল্প, কিম্বা নিবাসবাবুর জলদস্যুর গল্প। সুমন্তবাবুর নিজের তো আরো কঠিন অবস্থা। তিনি নিজেই নিজের গল্প সম্বন্ধে বলেন, গঞ্জিকাহিনী।

কাগজের ওপর একটা অক্ষর লিখেছেন কি লেখেন নি, দপ্ করে আলো নিভে গেল। তাঁর নাতনি করতালি দিয়ে উঠল, লোডশেডিং! সে তো নাচবেই! পড়াশোনা বন্ধ যে! জন্মেই এরা একটা ইংরিজি শব্দ শিখে নিয়েছে, লোডশেডিং। শব্দটা শিখতে সুমন্তবাবুকে যৌবন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সুমন্তবাবুর ইনভারটার নেই। একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বসলেন তিনি। লেখাতে মন দেবেন কি। এর মধ্যে আরেক উপদ্রব সুরু হল। দুটো পা জ্বলে যেতে লাগল। তিনি উঠে অডোমসটা নিয়ে দু'পায়ে খুব করে মালিশ করলেন। তারপর সেই টিমটিমে আলোয় লেখার চেষ্টা আরম্ভ করলেন।

বাইরে ঝপ্ঝপ্ শব্দ শুনে লেখা ফেলে চমকে উঠলেন তিনি। পরক্ষণেই বুঝলেন, আজ কলে জল আসেনি বলে ভারী জল এনেছে। সুমন্তবাবু ভাবলেন, কারো সর্বনাশ, কারো পোষমাস। আলো না আসা, কলে জল না আসা, এতে আর যাই হক, পুনের জেনারেটর কারখানার মালিক থেকে ওড়িশার বিষ্ণু মোহান্তি, সবাই কিছু করে খাচ্ছে। বিষ্ণুর বাঁকের টিন দুটো কেষ্টনগরের মুক্তকেশী বেগুনের মতন ভেতর দিকে তোবড়ানো হলে কী হবে, জলের দাম সোনার দামের মতনই লাফিয়ে লাকিয়ে বাড়ছে। আরেক দিন পরে লোকে 'জলের দামে' কথাটা আর বলবে না।

সুমন্তবাবু আবার লেখায় মন দিলেন প্লট-একটা ভেবে রেখেছেন। কী ভাবে সুরু করবেন সেটা কাগজে দু'একবার মকশো করলেন। হঠাৎ

বাইরে চীৎকার শুনে চমকে ওঠায় আবার লেখায় বাধা পড়ল। হরিবাবু রিকশাওলার সঙ্গে হম্বি-তম্বি করছেন। এই হরিবাবুই ইলিশমাছ কেনার সময় দূর থেকে একশো টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে মাছটা কেটে রাখতে বলেন। ওজন-টোজন দেখেন না। বলেন, ফেরার সময় নিয়ে যাব। অথচ, রিকশাওলার তিন টাকাকে দু'টাকা করার জন্যে কী চোটপাট! সুমন্তবাবু ভাবলেন, একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় কলকাতার বুকে আজও মানুষকে আরেকজন মানুষ বয়ে নিয়ে যায়। তাঁর গল্পের রোবটও যে কাজ করতে রাজি হবে না।

সব চিন্তা থেকে মনটাকে সরিয়ে এনে সুমন্ত বাবু লেখায় মন দিলেন। একবিংশ শতকে বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁর সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক চরিত্র কত অসম্ভবকে সম্ভব করছেন, তাই নিয়ে এক দুর্দান্ত গল্প লিখতে বসলেন। কালকেই সম্পাদক নিয়ে যাবেন। বিজ্ঞানকল্প লিখেই সুমন্তবাবুর খ্যাতি!

ইয়েতির ইতিবৃত্ত

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

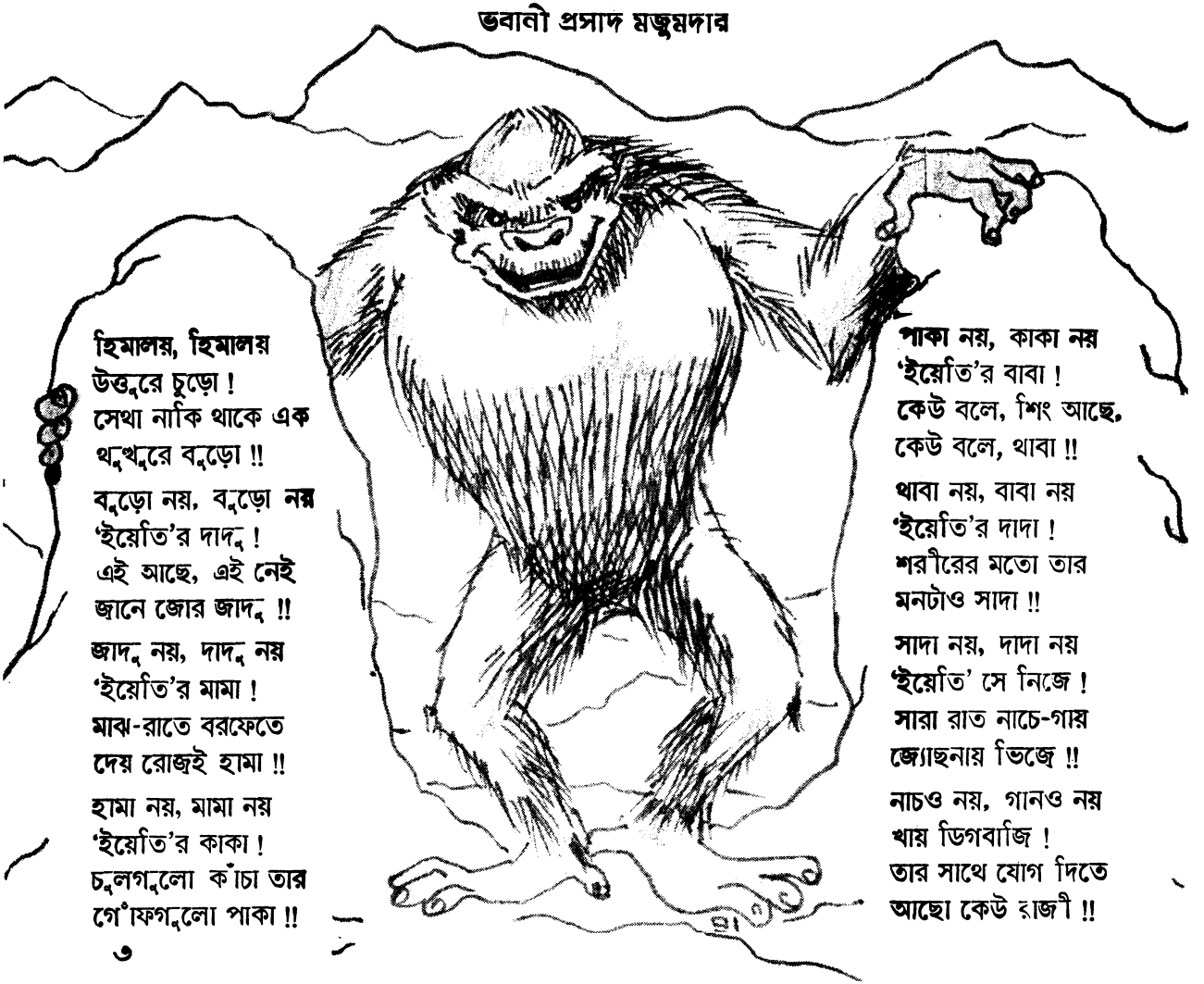

হিমালয়, হিমালয়
উত্তুরে চুড়ো!
সেথা নাকি থাকে এক
থুত্থুরে বুড়ো!!

বুড়ো নয়, বুড়ো নয়
'ইয়েতি'র দাদু!
এই আছে, এই নেই
জানে জোর জাদু!!

জাদু নয়, দাদু নয়
'ইয়েতি'র মামা!
মাঝ-রাতে বরফেতে
দেয় রোজই হামা!!

হামা নয়, মামা নয়
'ইয়েতি'র কাকা!
চুলগুলো কাঁচা তার
গোঁফগুলো পাকা!!

পাকা নয়, কাকা নয়
'ইয়েতি'র বাবা!
কেউ বলে, শিং আছে,
কেউ বলে, থাবা!!

থাবা নয়, বাবা নয়
'ইয়েতি'র দাদা!
শরীরের মতো তার
মনটাও সাদা!!

সাদা নয়, দাদা নয়
'ইয়েতি' সে নিজে!
সারা রাত নাচে-গায়
জ্যোছনায় ভিজে!!

নাচও নয়, গানও নয়
খায় ডিগবাজি!
তার সাথে যোগ দিতে
আছো কেউ রাজী!!

রাঙাবাবু

সুচন্দ্রনাথ দাস

অনাথবন্ধু মদনের জন্য জল খাবার নিয়ে আসেন জমিতে। মদন তাঁর জমিতে হাল করছে। অনাথবন্ধুকে দেখে মদন লাঙলের মুঠি শক্ত করে চেপে ধরে। জমির মালিককে কাজ দেখাতে হবে তো!

জমির উত্তর দক্ষিণে লাঙল চালানো হচ্ছে। অনাথবন্ধু উত্তর দিকের আলে দাঁড়িয়ে আছেন। লাঙল টানতে টানতে রাঙাবাবু মুখ তুলে অনাথবন্ধুকে দেখে। দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আসতে আসতে রাঙাবাবু ধপাস করে শুয়ে পড়ে।

অনাথবন্ধুর উদ্দেশ্যে মদন বলে, দেখছেন বাবু!

অনাথবন্ধু বলেন, ওদের একটু জিরেন দে। আর তুই জল খাবার খেয়ে নে। বেলা হয়েছে।

মদন লাঙল খুলে রেখে অনাথবন্ধুর কাছে আসে।

মুড়ি খেতে খেতে মদন বলে, আপনার রাঙাবাবু আর চলবে না বাবু।

বয়স বাড়লে মানুষের যে অবস্থা হয়, গরুরও তাই হয়। কম লাঙল টেনেছে রাঙাবাবু!

একটা ভালো বলদ আমার দেখা আছে। আপনার সাদা বলদের জুড়ি হবে ভাল।

এ বছর আর বলদ কিনব না। রাঙাবাবুকে নিয়েই চাষ তুলতে হবে।

মাঝে মাঝে শুয়ে পড়লে, খুব বিরক্তি লাগে!

এ বছরটা কোন রকমে চালাতে পারবি না?

চালাতে পারব না কেন? তবে সময় লাগবে বেশি। এক বিঘে জমি কাদা করতে কমপক্ষে দু'টো সকাল হাল বেশি লাগবে।

তা হোক! ঘরের হাল তো!

তাহ'লে আমার আপত্তি নেই।

বুঝলি মদন, রাঙাবাবু আমাদের ঘরের গাইয়ের বাছুর। ছোট বেলায় খুব দুরন্ত ছিল।

তাই না কি।

তবে আর বলছি কি! আজ এর গোয়ালের খড় ভূষি ছড়িয়ে আসছে, কাল তার বাগানের সবজি দলে পিষে আসছে। পড়শিরা বিক্রি করে দেবার পরামর্শ দিত। আমি জানতাম, রাঙাবাবু এক দিন শক্তিমান বলদ হবে।

আমি অনেক বাবুর জমিতে হালের কাজ করেছি। আপনার জমিতেই আজ বোধ হয় তিন বছর হাল করছি।

হ্যাঁ, তিন বছরই হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, রাঙাবাবুর মত বলদ নিয়ে, আগে কারোর জমিতে হাল করি নি। লাঙলের মুঠি ধরলেই হল। লেজে পাক দিতে হবে না। 'চল' বলতে হবে না। আপনা থেকেই লাঙল টানবে।

রাঙাবাবুকে কেনবার জন্য অনেক খদ্দের আসছে।

চাষ উঠলে কাতিক অঘ্রাণে বিক্রি করে দেবেন। আর রেখে লাভ নেই।

রোয়া চাষের কাজ শেষ হতেই মদন তার মাসতুতো ভাই বিপিন হাজরাকে নিয়ে অনাথবন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হয়।

বাবু, এই আমার মাসতুতো ভাই বিপিন। আপনার রাঙাবাবুকে কিনতে চায়।

অনাথবন্ধু বলেন, কিনতে চাইলে কি হবে, আমি তো রাঙাবাবুকে বিক্রি করব না।

মদন বলে, আমি বলছি বাবু, রাঙাবাবুকে রেখে আপনার লাভ নেই। ফি বছরে আর লাঙল

টানতে পারবে না।

একটু চিন্তা করে অনাথবন্ধু বলেন, আচ্ছা, পরে ভেবে দেখব।

আবার 'ব' বাঁধছেন কেন? এখনি ছেড়ে দিন

এক মাস হয় নি চাষ সেরে উঠেছে। রাঙাবাবুর শরীর ভেঙ্গে গেছে।

আপনি বলতে চাইছেন আষাঢ় মাসের দিকে রাঙাবাবুর শরীর ফিরে যাবে। তখন বিক্রি করলে বেশি দাম পাবেন!

বিপিন এবার মুখ খোলে; বলে, আমি আপনাকে সেই আষাঢ় মাসের দাম দেব। আপনাকে ঠকাব না।

অনাথবন্ধু আপত্তির স্বরে বলেন, না না, টাকার কথা আমি ভাবছি না।

মদন বলে, কথায় তো বলে, যে গরু না বায় হাল, তার দুঃখু চিরকাল।

রাঙাবাবুকে দেখে বিপিন লুব্ধ। মদন দালালী বাবদ পঞ্চাশ টাকা পাবে।

অনাথবন্ধু অসম্মত হলেও মদন বিপিনকে নিয়ে দিনের পর দিন অনাথবন্ধুর বাড়িতে আসে।

গিরিবালার সঙ্গে অনাথবন্ধু আলোচনা করে কী করা যায় বলতো গিরিবালা!

গিরিবালা বলেন, মদন আমাদের ক্ষেত খামারে কাজ করে দেয়। বিপদে আপদে ছুটে আসে। সে যখন অত করে বলছে,...

বোশেখ মাসের শেষের দিকে এক বিকেল বেলা অনাথবন্ধু রাঙাবাবুর বিক্রির ছাড়পত্র লিখে দেন।

রাঙাবাবু যাবে পাশের গাঁয়ে। ছাড়পত্র সঙ্গে না থাকলে বিপিনকে গরু চুরির দায়ে পড়তে হবে।

বিপিন অনাথবন্ধুর কাছ থেকে ছাড়পত্র বুঝে নেয়।

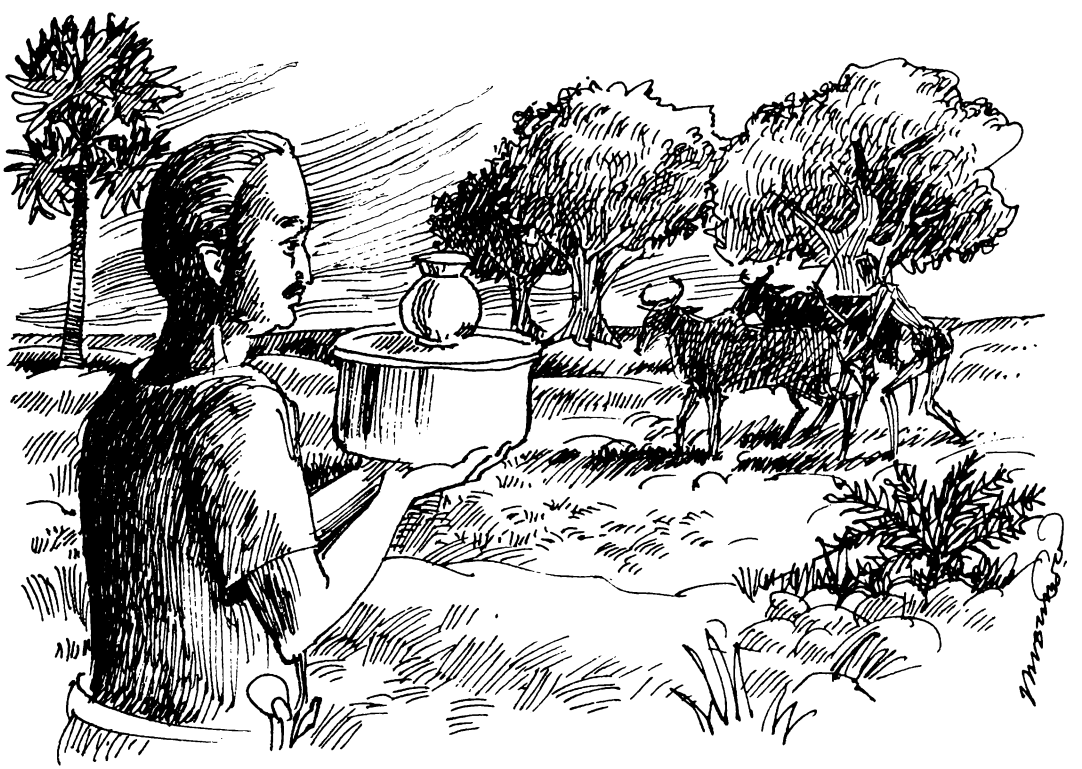

মদন এক আঁটি খড় নিয়ে এসে অনাথবন্ধুর উঠোনে বসে দড়ি পাকায়।

গিরিবালা কাঁসার থালায় হলুদ গোলা জল নিয়ে গিয়ে রাঙাবাবুর পা ধুইয়ে দেন। নিজের শাড়িতে পা মুছে দেন।

অনাথবন্ধু বিপিনের হাত থেকে এক হাজার এক টাকা নিয়ে রাঙাবাবুর বিক্রির ছাড়পত্র তুলে দেন।

মদন রাঙাবাবুর গলায় দড়ি বেঁধে আগে আগে চলে, পিছনে বিপিন।

যতদূর অব্দি দেখা যায় অনাথবন্ধু রাঙাবাবুকে দেখেন। পাশে দাঁড়িয়ে গিরিবালাও।

গিরিবালার চোখে জল; ধরা গলায় বলেন, গোয়ালটা ফাঁকা হয়ে গেল।

রাঙাবাবুর বিচ্ছেদে অনাথবন্ধুও ব্যথা পেয়েছেন। তবু গিরিবালাকে সান্ত্বনা দিতে বলেন, আবার নতুন গরু আসবে। গোয়াল ভরে যাবে। এই রকমই হয়। এ নিয়ম সব গেরস্থের গোয়ালের।

গিরিবালা গোয়াল ঘরে ঢোকেন। পোড়া মাটির যে গামলায় রাঙাবাবু জাবনা খেত, সেই গামলার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। রাঙাবাবুর স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় করে।

গামলায় নাক ডুবিয়ে জাবনা খাওয়ার অভ্যাস ছিল রাঙাবাবুর। একটু জলের ঘাটতি হলেই ডাকত, হাম্বা—

গিরিবালাকে যেন বলত, গিরিবালা জল দিয়ে যাও।

একটু দেরী হ'লে আবার হাম্বা। যেন বলত, আমি কিন্তু রাগ করছি। শিং দিয়ে গামলা উল্টে দেব, দড়ির পাখা ছিঁড়ে পুকুরে পালাব।

দড়ির যে পাখাতে রাঙাবাবুকে গোয়ালে বেঁধে রাখা হত গিরিবালা সে দড়িখানা হাতে তুলে নাড়া চাড়া করেন। দড়িতে এখনো রাঙাবাবুর গায়ের গন্ধ লেগে আছে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত গিরিবালা কল্পিত ছবি দেখেন; লাল রঙের একটা হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর সারা গোয়াল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গোয়াল ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছে।

ফের 'ব্যাঁ ব্যাঁ' শব্দে ডাকতে ডাকতে গোয়ালে এসে ঢুকছে।

রোদ ঝলমল উঠোনে খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে, তার উপর সাদা কাপড় বিছিয়ে শীতের সারা দুপুর ধরে গিরিবালা ডালের বড়ি দিয়েছেন। ক্লান্তিতে দালানের রোয়াকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

লাল বাছুরটা হঠাৎ উঠোনে ঢুকে পড়েছে। দাপাদাপি করছে। ব্যাঁ ব্যাঁ; যেন বলছে, গিরিবালা ঘুমুচ্ছে। কী মজা! এই বেলা ছুটো ছুটি করি।

এ্যাই দুষ্টু, এ্যাই দুষ্টু, বলে গিরিবালা তাকে তাড়া করছেন।

দেখতে দে-খ-তে রাঙাবাবুর দুটো শিং গজিয়েছে।

গিরিবালা রাঙাবাবুকে মাঠ থেকে নিয়ে এসে গোয়ালে বাঁধছেন, জাবনা খেতে দিচ্ছেন।

আহ্লাদে রাঙাবাবু গিরিবালার হাত চাটছে, শাড়ির আঁচল চিবুচ্ছে।

দুষ্টু দুষ্টু বলে গিরিবালা রাঙাবাবুর পিঠে চাপড় মারছেন।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে আষাঢ় মাসে। রাঙাবাবু বলদ হ'য়ে গেছে। তাকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাঁধে করে জোয়াল নিয়ে লাঙল টানছে!

তারপর একদিন বুড়ো হয়ে গেল রাঙাবাবু গরুর পরমায়ু মানুষের চেয়ে কম কি-না!

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনাথবন্ধু আই-ঢাই করেন। ঘুম আসে না চোখে। বুকের মধ্যে যেন ব্যথার পাষাণ চাপানো। রাঙাবাবুর কথা যত ভুলতে চেষ্টা করেন, রাঙাবাবুর স্মৃতি তত বেশি ক'রে মনের মধ্যে ভীড় করে। চোখ বন্ধ করেও স্পষ্ট দেখতে পান, রাঙাবাবুর মায়াময়, কাজল-কালো, সকরুণ চোখ দুটো।

সদর দরজা খুলে অনাথবন্ধু বাইরে বেরিয়ে আসেন। গোয়াল ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান।

শুক্লা তিথির চাঁদের আলোয় আলোকিত

গোয়াল ঘর। অনাথবন্ধু দেখেন, সাদা বলদটা শুয়ে থেকে জাবর কাটছে। অনাথবন্ধুকে দেখে সাদা বলদটা কান ঝাপটায়। অনাথবন্ধুর উদ্দেশে হয়তো বলে, রাঙাবাবুকে বেচে দিয়েছেন তো। আমার সাফ্ কথা, আমি একা থাকতে পারব না। আমার সঙ্গী চাই। নিদেন পক্ষে একটা বাছুর। দু'টো গল্প ক'রে সময় কাটবে।

অনাথবন্ধু সাদা বলদের মনের কথা বুঝতে পারেন না। রাঙাবাবু থাকলে অনাথবন্ধুকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াত। ডাল-ভূষি পাবার আশায় লেজ নাড়ত, কান ঝাপটাত।

অনাথবন্ধু একমুঠো ভূষি নিয়ে গোয়াল ঘরে ঢুকতেন। রাঙাবাবুর গামলাতে দিয়ে, তাঁর গলকম্বলে হাত বুলাতেন।

আজ আর গোয়াল ঘরে ঢুকলেন না।

গোয়াল ঘরটা খুব ফাঁকা ফাঁকা। অনাথবন্ধুর বুকের মধ্যেও শূন্যতার বাসা।

এখন অনাথবন্ধুর মনে হয়, রাঙাবাবুকে বিক্রি না করলেই ভাল করতেন।

মনে মনে খুব অনুতপ্ত।

রাঙাবাবুকে কী রকম ভালবাসতেন, এখন তা উপলব্ধি করতে পারছেন।

আর দু'বছর পরে রাঙাবাবু লাঙল টানার কাজ করতে পারত না। তাতে বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। সে খড়-ঘাস খেত, তার বদলে গোবর দিত।

একদিন পরেই রাঙাবাবুকে নিয়ে বিপিন আসে।

অনাথবাবু, অনাথবাবু—

বিপিনের ডাকে অনাথবন্ধু বাইরে আসেন।

কী ব্যাপার বিপিন?

আপনার রাঙাবাবু—

বিপিনের কথা শেষ হবার আগেই গিরিবালা বেরিয়ে আসেন; উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞেস করেন, রাঙাবাবুর কী হয়েছে?

আপনাদের গোয়ালে জাবনা খাচ্ছে। তাকে বাঁধুন।

গিরিবালা আর কিছু শোনার অপেক্ষা না ক'রে গোয়ালের দিকে চ'লে যান।

সবিস্ময়ে অনাথবন্ধু জিজ্ঞেস করেন, রাঙাবাবুকে ফিরিয়ে নিয়ে এলে কেন?

বিপিন বলে, রাঙাবাবু না মরলে আপনার গোয়াল ছেড়ে কোথাও থাকবে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন অনাথবন্ধু।

বিপিন বলে, আমার গোয়ালে গিয়ে একটা খড় দাঁতে কাটে নি। বাঁচবে কী ক'রে?

অনাথবন্ধু বলেন, বুঝলে বিপিন, গরু অবলা জন্তু। কথা বলতে পারে না। তবে মানুষের ভালবাসা বুঝতে পারে। মানুষ যেমন আজন্মের স্মৃতি-বিজড়িত বাড়ি-ঘর, বাগান-পুকুর ছেড়ে যেতে কাঁদে, এক একটা গরুও সেই রকম দুঃখ পায় কাঁদে।

রাঙাবাবু আপনার গোয়ালের মায়া ত্যাগ ক'রে কোথাও গিয়ে থাকবে না। জোর ক'রে রাখলে, না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরবে।

বিপিনকে তার টাকা ফেরৎ দিয়ে অনাথবন্ধু গোয়াল ঘরে আসেন।

গিরিবালা রাঙাবাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে, খড় ভূষি খেতে দিচ্ছিলেন। অনাথবন্ধু গোয়ালে ঢোকেন; ডাকেন, রাঙাবাবু।

রাঙাবাবু হাম্বা হাম্বা শব্দ ক'রে যেন বলে, তুমি আমাকে বেচে দিয়েছিলে না? আমি খুব রাগ করেছি।

তোমার সঙ্গে আড়ি – আড়ি—আড়ি।

রাঙাবাবু অনাথবন্ধুকে এক পলক দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জিভ্ দিয়ে গিরিবালার হাত চাটে।

গিরিবালা বলেন, রাঙাবাবু তোমার উপর রাগ করেছে, বুঝলে।

না রে, রাঙাবাবু আর তোকে তাড়িয়ে দেব না। যতদিন বাঁচবি, আমার গোয়ালেই থাকবি। বলতে বলতে অনাথবন্ধু রাঙাবাবুর গলকম্বলে হাত বুলাতে থাকেন। রাঙাবাবু ছাদের দিকে মুখ তুলে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অনাথবন্ধুর আদর মাখে।

ন্যাড়া
হি জি বিজ বিজ
স্পোর্টস-এ
সরু বীমে ব্যালান্স ০০
সাবাস্ ন্যাড়া
ওপ্‌স্
বাহ্
হু-ই-ই
সামলে ন্যাড়া
হুররে-এ-এ
ন্যাড়া-আ
ন্যাড়া জিতেছে
!
ওখানে ওঠো ন্যাড়া। সভাপতি তোমায় মালা পরিয়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন
ওবাবা কত উঁচু
এসো ব্যালান্স বীর
হু০০উ০উ০০ ন্যা-ড়া
মরেছে
আহা সামলে
অপূর্ব ব্যালান্স প্রদর্শনকারী ন্যাড়াকে ব্যালান্সবীর সম্মানে ভূষিত করবেন সভাপতি
গেছি রে
তোমাকে এ সম্মানে ভূষিত করতে পেরে আমি গর্বিত। আর একটু এগিয়ে দাও মাথাটা, এসো
গেলুম
এঁঃ
!
?

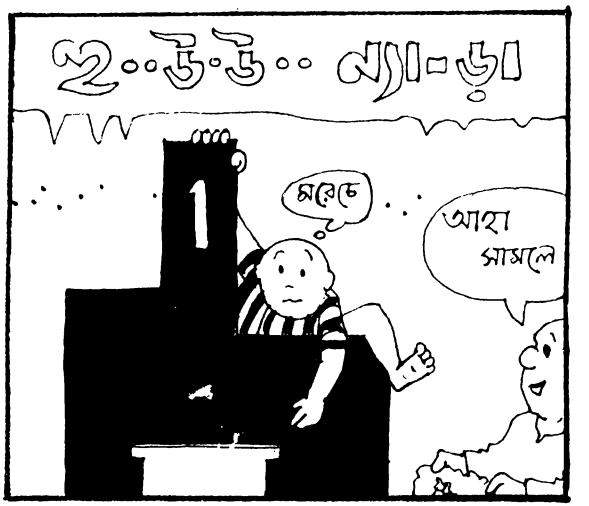

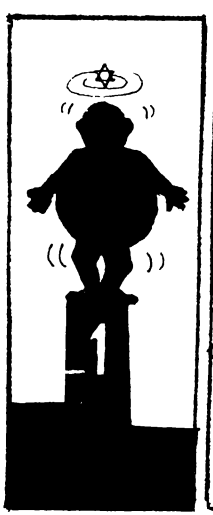

ধারাবাহিক উপন্যাস

লালঠিয়ার ভয়

সলিল চট্টোপাধ্যায়

একটি নকশা ও চিঠি

সারাদিন টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট কাদায় প্যাচপেচে—জামা প্যান্ট জুতো ভিজে গেছে অনেকক্ষণ—তালা খুলে ঘরে ঢুকে যেন বাঁচলাম। জামা কাপড় ছেড়ে বাইরের ঘরে চেয়ারে বসতে যাবো, চোখে পড়ল জানালার নিচে কটি চিঠি এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। হাতে নিয়ে দেখি সবই দিদির। একটা মাত্র আমার; বেশ বড় খাম—প্রেরকের নাম দেখে একটু অবাক হলাম—'অনিন্দ্য রায়' ছেলেবেলার বন্ধু; স্কুল ও কলেজে একসংগে পড়েছি। ওর বাবার মধ্য প্রদেশে কোথায় কোথায় খনি ইত্যাদির ব্যবসা ছিল। ফি বছর নববর্ষ আর বিজয়ায় চিঠি দিত—তাতে জেনেছিলাম দুরগ্‌ জেলায় খয়রাগড় তহ্‌শীলের ভেতরে লালবন্ঠিয়া বলে একটা জায়গা আছে—মহাকাল পাহাড়ের মাঝে এক উপত্যকা—

সেখানে ও মস্ত একটা ফার্ম করেছে, শুধু গরু মুরগী পোষাই নয়—দুষ্প্রাপ্য সব ভেষজের বাগানও করেছে এবং ওর লালবন্ঠিয়া হারবাল ফার্ম থেকে অনেক ওষুধ কোম্পানী নানা গাছের ডাল পাতা শেকড় কিনে নেয়। অনেকবারই ও যেতে লিখেছিল কিন্তু কলকাতা থেকে অতদূরে আর যাওয়া হয়নি।

খামটা খুলতে একটা হাতে আঁকা নকশা, একটা দীর্ঘ চিঠি আর পাঁচশ টাকার একটা ব্যাংক ড্রাফট। চিঠিটা তিন পাতা—প্রথম দিকে আমাদের পারিবারিক কিছু কথাবার্তার পর লিখেছে—'তোকে এই চিঠি লিখছি বিশেষ কারণে। মনে পড়ছে তুই বেংগল ব্যাট্যালিয়ানের শুটিং কম্পিটিশানে গোল্ড মেডাল পেয়েছিলি। অভ্যাস আছে তো?

নকশায় দেখবি আমাদের ভেষজ বাগানটা পাহাড়ের ওপর দিকটায়। বাংলোটাও সেখানে। নীচের দিকে এগ্রি ফার্ম। ধান, আলু, ভুট্টা এসব চাষ হয়। আর এ্যানিম্যাল ফার্ম মানে গরু, মুরগী, খরগোস, গিনি ফাউল এদের শেডগুলো এগ্রিফার্ম থেকে বাংলোয় আসার পথের ধারে। আমাদের ওয়ার্কাররা দুটো ভাগে,—একদল থাকে এই এ্যানিম্যাল ফার্মের পাশে 'কমিনিবাসে'। আরেকদল যারা ক্ষেতে খাটে—তারা থাকে 'মজুর বসতি'তে—লালবন্ঠিয়া নদীর ধারে। ওর পেছনে—লালবন্ঠিয়ার ওপারে একটা পরিত্যক্ত খাদ কুড়ি বছর আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লালবন্ঠিয়ার জলেই আমাদের চাষবাস। যে পাহাড়ে আমাদের বাংলো সেটার নাম 'বিল্লীকোট' আর খনি পাহাড়টার নাম 'লালকোট'। এ দুই পাহাড়ের মাঝে লালবন্ঠিয়ার গভীর খাত। এই নদীটা পড়েছে শিওনাথ নদীতে। বড় ম্যাপে শিওনাথকে খুঁজে পাবি।

আমরা এখানে অনেক লোক। সারা বছরের শুধু ধান জমা রাখতে দশ বারোটা গোলা করতে হয়। এছাড়া ডাল গম এসব তো আছেই। কর্মি নিবাসের পাশে পাকা গুদাম-ঘর কিন্তু ধানগোলাগুলো বাংলোর পাশে।

গত কিছুদিন ধরে রোজ রাতে কোনা কিছু এসে গোলা ভেঙে ধান খেয়ে তছনছ করে যাচ্ছে। গত সাতদিনে প্রায় অর্ধেক গোলা সাবাড়। বাবার একটা ডি বি বি এল ছিল। সেটা নিয়ে সারারাত পাহারা দিচ্ছি। ওটা কখন আসছে ধরতে পারছি না। গোলার সামনে বাতি জ্বালিয়ে লোক বসিয়ে রাখছি। বাংলোর বারান্দায় বন্দুকটা নিয়ে বসে থাকছি। এমনিতে ভেষজ বাগান, বাংলো, কর্মিনিবাস থেকে কর্মশালা পুরো এলাকা কাঁটাতার আর ফনি-মনসা দিয়ে ঘেরা। বুনো জন্তু ঠেকাবার জন্য এই ঘেরা আগেই ছিল। এখন ফসলের খেতের চারদিকটাও ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাতে সব গেট বন্ধ করে দেওয়ার পরে এই রহস্যময় জন্তুটি কোনদিক থেকে আসছে ধরা যাচ্ছে না। পরশু রাতে তিনজন লোক বর্শা লাঠি নিয়ে পাহারা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে, আমি বারান্দায় টর্চ বন্দুক নিয়ে ঘুমে ঢুলছি এমন সময় প্রায় মাটি ফুঁড়ে এক বিশাল জন্তু লোক দুজনকে দুপাশে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গোলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তৃতীয় জন বোধ হয় ভয়ে পালিয়ে ছিল। ওদের চিৎকারে আমার ঝিমুনি ভেঙে লাফিয়ে উঠে দেখি হ্যারিকেনটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর একটা বিশাল জন্তু গোলার ওপর উঠে তছ নছ করছে; ওর লম্বা লেজটা কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। অন্ধকারে ওই ছায়াটাকেই লক্ষ্য করে পর পর দুবার গুলি করলাম। ওটা লাফিয়ে পড়ে বাংলোর সামনের রাস্তা ধরে কর্মশালার দিকে ছুটে গেল। কর্মশালায় যারা ছিল তারা দেখতে পায় ওটাকে মজুর বসতির দিকে ছুটতে। মজুর বসতির

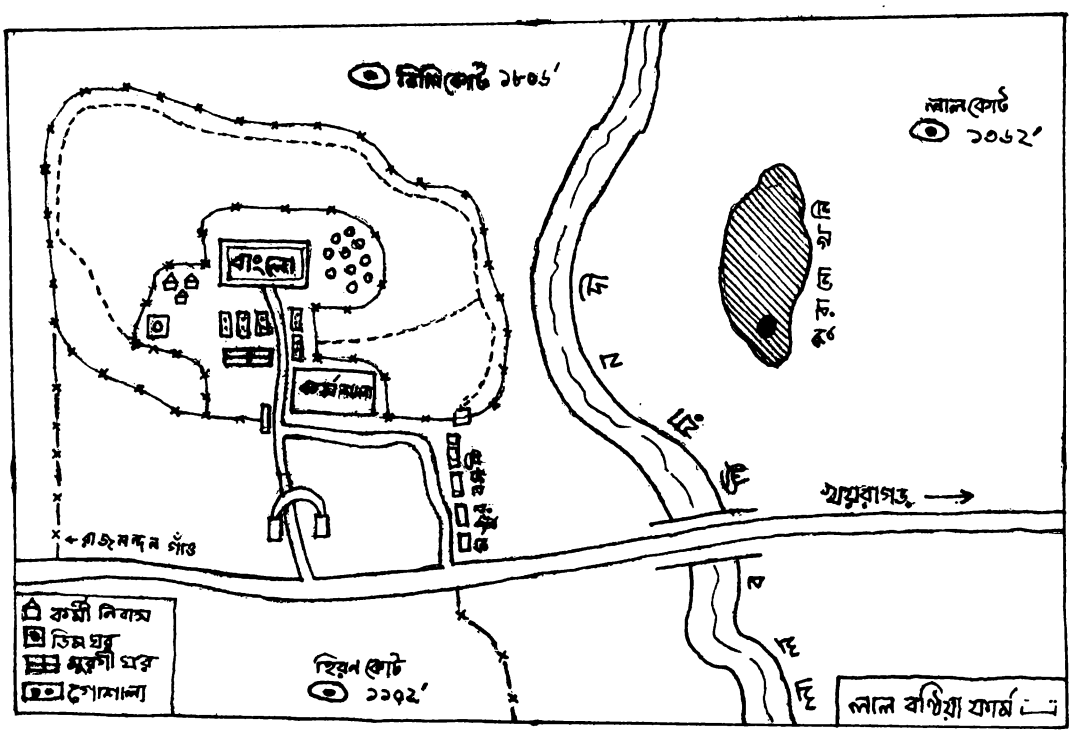

পেছনে, আগেই বলেছি সেই পুরানো খনিটা। আমার বিশ্বাস ওই খনির খাদটাই ওর আস্তানা। টর্চের আলোয় ওর লম্বা লেজটা ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারিনি। ওই অল্প সময়ে ধান বেশ খানিকটা খেয়েছে। ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফার্মে কয়েকটা দেশি কুকুর ছিল। তার একটাকে কদিন আগে কর্মশালার সামনে পাওয়া গেল। গলায় একটা গভীর ক্ষত। হনে হয় বাঘ জাতীয় কোন প্রাণী ওর টুঁটি কামড়ে শেষ করে দিয়েছে। বাকিগুলো নিপাত্তা।

এখন সারারাত টহলদারি চলছে। বন্দুক ঘাড়ে ঘুরছি। দিনে ফার্মের কাজে ফুরসত নেই। কর্মীরা সবাই ভীত। নান্দগাঁও গিয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছি। তারা কোনো গুরুত্ব দেয় নি। তোর সাহায্য চাইছি। হাতিয়ারের অভাব হবে না। বাবার কটা রাইফেল পড়ে আছে। তুই চলে আয়।

কবে আসছিস টেলিগ্রাম করে জানাস। আমি নান্দগাঁওতে জীপ নিয়ে থাকব।"

দীর্ঘ চিঠিটা বার দুই পড়লাম এবং সংগে সংগেই ঠিক করলাম যাব। অনিন্দ্যর বিপদে ওর পাশে দাঁড়াতে হবে। বাবা মারা যাবার পর—দিদি তখনো কলেজের চাকরিটা পায়নি—মা অসুস্থ—সে সময় অনিন্দ্য সাহায্য না করলে আমার বি-এস-সি পরীক্ষা দেওয়া হত না। ড্রাফটটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরে ওর ঠিকানাটা লিখলাম—সংগে একটা চিরকুটে লিখে দিলাম—'আসছি, টিকিট করেই জানাবো।' পরদিন সকালেই ছুটলাম টিকিট কাটতে বহদূর পথ—রিজার্ভেশান ছাড়া যাওয়া কষ্টকর। ভাগ্য বলতে হবে বন্ধু সুদীপ্তকে পেয়ে গেলাম বুকিং অফিসে। ওই ব্যবস্থা করে দিল—তিন দিন পরে বম্বে মেলে। সি-টি-ও থেকে অনিন্দ্যকে টেলিগ্রাম করলাম। তারপর অফিস। এ সময় ছুটি পাওয়া কঠিন—তবে আমি দীর্ঘদিন ছুটি নিই নি—তাই ছুটিও পেয়ে গেলাম—একসংগে টানা পনেরো দিন।

লালবন্ধিয়া

মধ্যপ্রদেশের এদিকটা একেবারেই অজানা। নান্দগাঁও যখন পৌঁছলাম বিকেল প্রায় পাঁচটা—দুরুগ্ থেকে বাসে আসতে এক ঘন্টার ওপর লেগে গেল। বাস স্ট্যান্ডে নেমে এদিক ওদিক দেখছি, অনিন্দ্যর পাত্তা নেই—ভাবছি কি করব—এমন সময় পেছন থেকে কেউ টান দিয়ে আমার হাতের ব্যাগটা কেড়ে নিল—চমকে ঘুরে দেখি—শ্রীযুক্ত অনিন্দ্য

রায়—অনেকদিন পরে দেখা—সেই টকটকে ফর্সা রঙটা তামা হয়ে গেছে—চুলগুলো রুক্ষ—পরনে খাকি শার্ট শর্টস্—পায়ে কাদামাখা হান্টিং শূ।—'তুই তাহলে এলি। আজ তোর চিঠি টেলিগ্রাম একসংগে এসেছে। চল জীপটা ওধারে।'

জীপের পেছনে আরও দুজন লোক অনেক জিনিসপত্র নিয়ে বসে আছে। অনিন্দ্য আলাপ করিয়ে দিল একজন ওদের চৌকিদার মুনাওয়ার সিং। আরেকজন রমানাথ দে এ্যাকউন্টেট।

নান্দগাঁও থেকে লালবন্ঠিয়ার রাস্তাটা খুব খারাপ-ভাঙাচোরা—রাস্তার দুপাশে গেরুয়া জলের স্রোত বইছে—বাঁধারে পাহাড়ের সারি—এটাই তাহলে ম্যাপে দেখা মহাকাল পাহাড়। পাহাড় এমন কিছু উঁচু নয়—কিন্তু জংগলে ঢাকা—ডানদিকে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো জমি—জিজ্ঞাসা করি—এখানে জন্তু জানোয়ার কি আছে?

অনিন্দ্য গাড়ি চালাচ্ছে খুব সন্তর্পণে—রাস্তার ওপর চোখ রেখেই জবাব দেয়—'ছেলে-বেলায় বাবাকে দেখেছি চিতাবাঘ সম্বর শিকার করতে। সেসব এখন অনেক ভেতরে পেলেও পাওয়া যেতে পারে দু একটা। আমাদের ফার্মের আশে পাশে একসময় বনমুরগী ময়ূর তিতির অনেক পাওয়া যেত।' লালবন্ঠিয়া পৌঁছতে রাত হয়ে গেল—গাড়ি বাংলো পর্যন্ত গেল না—উৎকট গন্ধে বুঝতে পারলাম মুরগী খামারের কাছে নেমেছি। বাংলোয় পৌঁছে দেখি ধান গোলার পাশে বড় বড় বাতি বসানো হয়েছে—দশ বারোজন লোক বর্শা তীর ধনুক নিয়ে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'একয়-দিনে নতুন কিছু ঘটেছে?'

—তোকে যেদিন চিঠি লিখি সেদিন সন্ধ্যা বেলায় মজুর বস্তি থেকে ওরা দেখতে পায় একটা ছায়ার মত কিছু বাংলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে। বাংলোয় তখন বুড়ি নিরুদি—আমাদের রাঁধুনী ছাড়া কেউ ছিল না—উনি কানে ভাল শুনতে পান না। জন্তুটা যথারীতি গোলা ভেঙে ধান শেষ করতে থাকে—লেবাররা মুনাওয়ারকে খবর দেয়—সবাই ছুটে যায় বাংলোর দিকে—জন্তুটা ওদের প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে দুলাফে ফের নিচের দিকেই অদৃশ্য হয়। তার পরদিনই দুটা ব্যাটারী বসিয়ে ওই বাতিগুলো জ্বালিয়েছি—তারপর এখন পর্যন্ত আর কোনও উপদ্রব হয়নি। দুটো টিমে সারারাত পাহারা চলেছে।'

খেয়ে দেয়ে রাইফেলগুলো নিয়ে বসলাম—ম্যাগনাম একটা—ফোর সেভেন ফাইভ—ঠিকমত নিশানা করে মারলে একশ গজ দূর থেকেও বুনো মোষ বা শূয়োরকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেওয়া যায়। আরেকটা—থ্রি ওয়ান ফাইভ উইনচেস্টার—তবে সেটা একটু খারাপ—ম্যাগাজিনের কেসটা লাগছে না—পড়ে যাচ্ছে—ফ্লাইটাও নেই। আর ডি বি বি এল গ্রীণার, যেটা অনিন্দ্য ব্যবহার করছে সবগুলোই বহুদিন সাফ করা হয়নি। ম্যাগনামটায় তিনটে বুলেট ভরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

নীচে লেবার কোয়ার্টারে বাতি জ্বলছে। কমিনিবাস থেকে লোকজনের কথাবার্তা ভেসে আসছে। বৃষ্টি থেমে সারা উপত্যকা জুড়ে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ আর গেছো ব্যাঙের ডাক সুরু হয়েছে—মেঘ সরে একফালি চাঁদ বেরিয়ে এল—তিন দিকের পাহাড়ের কালো সীমারেখাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল—অনেক নীচে লালবন্ঠিয়ার জলরেখা চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠল। পাহারার লোকেরা গোলার পাশে ত্রিপল টাঙিয়ে তার নীচে খাটিয়া পেতে গান ধরেছে।

অনিন্দ্য বলল একটা কথা—'আমাদের এই মুনাওয়ার বলছিল—ও কিন্তু এখানকার আদি-বাসী—বাচ্চা বয়স থেকে বাবার কাছে—আগে খনিতে কুলিদের মেট্ ছিল তারপর খনি বন্ধ হয়ে গেলে এই জীপের ড্রাইভার হল—আমরা চৌকিদার বললেও আসলে গোটা ফার্মের সিকিউরিটি অ্যানিম্যাল ফার্মের সব দায়িত্বও ওর ঘাড়ে—'

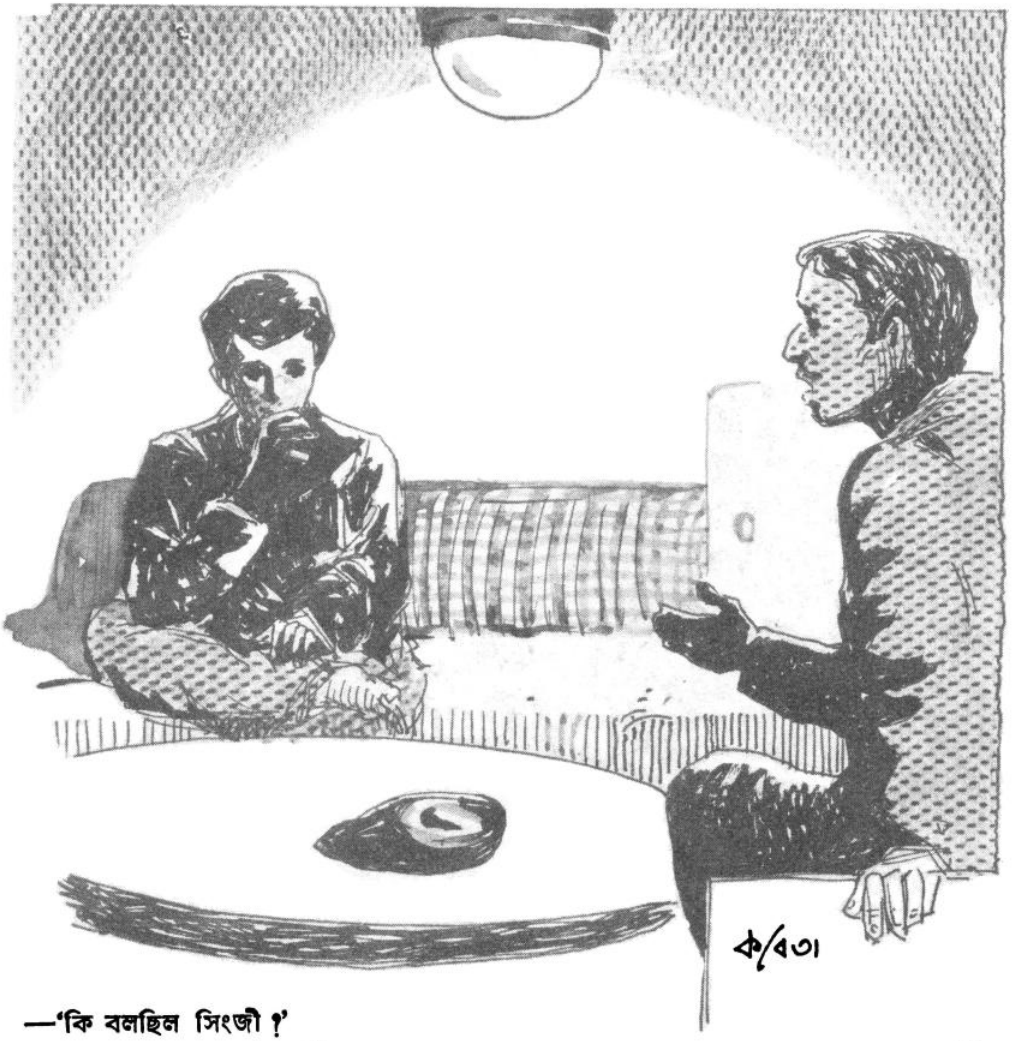

—'কি বলছিল সিংজী ?'

—'ওদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে—'নাগিয়া বলে একটা অশুভ অপদেবতা গোছের কিছু আছে—সেটা কোনো লোকের বা জন্তুর ওপর ভর করে গ্রামের সর্বনাশ করে—'

—'তুই না বিজ্ঞানের ছাত্র—এসব বিশ্বাস করিস ?'

অনিন্দ্য চুপ করে বসে রইল। মাথার ওপর বায়োগ্যাসের বাতিটা ঘিরে কতগুলো বাদুলে পোকা ঘুরপাক খাচ্ছে—দুই প্রান্তে দুটো টিকটিকি ওদিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। আমিই বলতে সুরু করি—

—'শোন কাজের কথায় আয়—প্রথমেই দরকার জন্তুটাকে চেনা—তাহলে এলিমিনেট মানে খতম করাও সহজ হবে।' বাধা দিয়ে অনিন্দ্য বলে 'আচ্ছা বলতে পারিস—গরুর মত সাইজ, বিশাল লম্বা লেজ আলা কি প্রাণী থাকতে পারে—দশ বারো ফুট গোলার ওপর লাফিয়ে উঠছে দশ বারো সেকেণ্ডে তিন চারশ গজ দৌড়ে যাচ্ছে—এক এক বারে দশ বারো কেজি ধান খেয়ে নিচ্ছে'—

—'ব্যাপারটা ও ভাবে দেখলে হবে না—জন্তুটা সম্পর্কে সব তথ্য যাচাই করে দেখতে হবে। এরকম হয়—মানুষের চোখ কান অনেক সময়ই মানুষকে প্রতারণা করে—ভয়ও মানুষকে অনেক কিছু ভুল দেখায় বা বোঝায়।'

—তুই বলতে চাইছিস আমি ভুল দেখেছি—

—না। আমি বলছি তুই যা দেখেছিস সেগুলিকে যাচাই করলেই হয়ত এই রহস্যময়ের প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়বে। যেমন ধর—জন্তুটাকে পরিষ্কার কেউই দেখিসনি—যেটুকু দেখেছিস সেটাও অন্ধকারে—তাই ওর আকার

সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। যেটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় তা হল—এক—ধান ওর খুব প্রিয় খাদ্য, বারবার ধান গোলায় আসছে—দুই ওর রাক্ষুসে ক্ষুধা আর তিন নম্বর হচ্ছে—লম্বা লেজ আছে। তাহলে লেজ থেকে সুরু করি—লম্বা লেজ সরীসৃপদের হয়। তারপর বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের প্রায় সবারই লম্বা লেজ আছে। মনগুজ জাতের ভাম, উদবিড়াল এরা কেউ কেউ তিন চার ফুট বড় হয়, লেজ ও বেশ লম্বা—কিন্তু এরা কেউই ধান খাবে কিনা—তাও ওই পরিমানে—সন্দেহ। বাকী থাকল ইঁদুর জাতীয়রা। তারা ধান খুবই পছন্দ করে—খায়ও খুব—লেজও বেশ লম্বা—কিন্তু সবচেয়ে বড় ইঁদুর—লেজ নিয়ে দু তিন ফুটের বেশি হবে না—যাকে আমরা মেঠো ইঁদুর কি গেছো ইঁদুর বলি—মানে ব্যাণ্ডিকুট—তার একটির ক্ষমতা হবে না—ওই সময়ে অতটা ধান শেষ করা।'

অনিন্দ্য বাধা দিয়ে বলে—'জন্তুটা পাঁচ ফুট মত, লেজটা পাঁচ, ছ ফুট হতে পারে—আমি বাবার সংগে ছেলেবেলায় বনে জংগলে অনেক ঘুরেছি—অন্ধকারে হলেও একটা জন্তুর আকার মোটামুটি ধারণা করতে পারি।'

—'আমি তোকে অবিশ্বাস করছি না। দিদি একবার তোর এখানে আসতে চেয়েছিল—বলেছিল এটা প্রাচীন পৃথিবীর প্রাচীনতম অংশ—এই গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তপ্রদেশ—এখানে নাকি অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত অনেক উদ্ভিদ থাকতে পারে—হতে পারে কোন অজ্ঞাত প্রাণীও থেকে গেছে।'

—'তুই ভুল করছিস—অজ্ঞাত উদ্ভিদ আর প্রাণী এক কথা নয়—একটা লতা বা গুল্ম বনে জংগলে লুকানো থাকতেই পারে—কিন্তু এত বড় একটা প্রাণী ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে হঠাৎ লালবন্ঠিয়ায় এসে হাজির হল—এরকম একটা ক্ষতিকারক জীব এ অঞ্চলে থাকলে তার নাশকতা আগেও শোনা যেত, কিন্তু তা কখনও শোনা যায়নি।'

—'না শোনার অনেক কারণ থাকতে পারে। এ রকম ফার্ম—এত সঞ্চিত খাবার বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও নেই—অশিক্ষিত কুসংস্কার-মনস্ক এ অঞ্চলের লোকেরা আর দশটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত এর উপদ্রবও হয়ত কোন ভৌতিক বা দৈবিক ব্যাখ্যা দিয়েই নিশ্চিন্ত থেকেছে। আমি না থেমেই বলি—'আর তাছাড়া তুই বোধ হয় জানিস এখন প্রত্যেক বছর ধান কাটার সময় দলে দলে হাতি—ডুয়ার্সে, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে ধান ক্ষেতে নেমে আসে—যা আগে হতো না। বনে ওদের স্বাভাবিক খাদ্য ও আশ্রয় আমাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলেই ওরা বাধ্য হচ্ছে লোকালয়ে আসত। হতে পারে এর বেলায়ও তাই ঘটেছে।' আমি একটু হেসে বলি—'এটা কোনো প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী হতে অসুবিধা কোথায়! দেভোনিয়ান যুগের একটা মাছ—সিলাকান্থ—যেটার ফসিল নিয়ে বিবর্তনের গবেষণা হচ্ছিল—বছর চল্লিশ আগে মাডাগাস্কারের কাছে হঠাৎই জেলেদের জালে উঠে এল। পাখনার জায়গায় পরিস্কার হাত পায়ের মত প্রত্যংগ—তারপর আর ও কয়েক জায়গায় ধরা পড়ে।'

—'তুই দিদিকে লিখে দেনা—ওর সহকর্মিদের মধ্যে জীববিজ্ঞানীরা হয়ত এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে।'

'তার চেয়ে বরং চল আমাদের জুলোজির হেড জে-কে-জি এখন নাগপুরের কাছে একটা ইওনিভার্সিটিতে আছে।'

—'এখন শুবি চল—সারাদিনের ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত হয়ে আছিস। তোকে ভোর রাতে ডেকে দেব—এখন সাড়ে নটা—সাড়ে তিনটে থেকে তুই পাহারা দিবি। অনেকদিন পরে আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাবো।'

হাই চাপতে চাপতে বিছানার দিকে এগিয়ে

যাই, 'ভাবছি এই থ্রি ওয়ান ফাইভটা কাল ঠিক করে নেব। এটা ব্যবহার করা অনেক সুবিধা—আমাকে একটা ভাল স্ক্রুডাইভার দিস তো।'

—'সুনীল আমাদের মেকানিক—পাম্প ট্র্যাকটর সব ওর জিম্মায়—ওর কাছে নিশ্চয়ই পাবি।'

আবির্ভাব

বিছানায় শোবার পর বোধ হয় সংগে সংগেই ঘুমিয়ে গেছি। কিসের একটা চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটা

অন্ধকারে মনে করতে পারলাম না কোথায় আছি এবং কেন—মনে হল কলকাতার বাসায় শুয়ে আছি এবং নিশ্চয় পাশের গলিতে চোর ঢুকেছে। বেড সুইচ জ্বালাতে হাত বাড়াতেই রাইফেলের ঠাণ্ডা নলটা লাগল এবং 'দিদি' ডাকতে গিয়ে চুপ করে গেলাম—এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ফোর সেভেন ফাইভটা টেনে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ধান গোলার পাহারাদাররা নীচের দিকে ছুটছে—

ওদের সংগে ছুটতে ছুটতে হাজির হলাম মুরগী খামারের সামনে—টর্চটা ফেলে এসেছি বিছানায়—অনিন্দ্যর টর্চটা স্থির হয়ে আছে—মুরগী খামারের সামনে ৩নং গুদামের দরজার ওপর। দরজাটা খোলা একটা পাল্লা এককাতে হেলে আছে—আর খোলা দরজা দিয়ে ঝুরঝুর করে নেমে আসছে কতগুলো ছেঁড়া বস্তা থেকে—ছোলা কড়াইশুঁটি ইত্যাদি। একটু আগে মুনাওয়ার সিংয়ের চাৎকারে সবাই এখানে ছুটে আসে—সিংজী কজনকে নিয়ে ছুটেছে জন্তুটাকে তাড়া করে।

[চলবে]

মওকা

সুখেন্দু মজুমদার

কটা দিন ছুটি পেলে পড়াশোনা সব ফেলে
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে,
চলে যাব পায় পায় আকাশের সীমানায়
মাঠ বন পেরিয়ে।
যেতে পার তোমরাও কেউ যদি যেতে চাও
বলে রাখি গোড়াতে,
সারাদিন ঘোরাঘুরি মেঘে মেঘে লুকোচুরি
জিন দিয়ে ঘোড়াতে।
বলে রাখি কানে কানে যেতে যেতে কোনখানে
মেলে যদি মওকা,
হয়ে যাব পারাপার চড়ে নিয়ে মজাদার
মেঘেদের নৌকা।
তারপর দিন দেখে মাঠ বন ফেলে রেখে
ফিরে এসে দোলাতে,
সব ভুলে বিলকুল যেতে হবে ইস্কুল
বই নিয়ে ঝোলাতে।

উদো-বুধো

অপূর্ব দত্ত

উদো এসে বুধোর ঘাড়ে
ধাক্কা দিল জোরসে
বুধো রেগে উদোর চোখে
ছিটিয়ে দিল সরষে।
অঙ্ক স্যার দুইজনকেই
ঢুকিয়ে চটের বস্তাতে
মেছোহাটায় বেচে দিলেন
জলের দামে. শস্তাতে।

ভগবানের কাছে চিঠি

পলাশ বরণ পাল

(প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে)

তিনকুলে কেউ নেই, বুড়ি থাকে একলা তার ছোট্টো কুঁড়ে ঘরে। এর-ওর-তার ফাইফরমাশ খেটে দেয়, তা থেকে দু-চারটে পয়সা পায়, আর তাছাড়া চেয়েচিন্তে এটা-ওটা, ব্যস্, ওতেই দিন চলে যায় বুড়ির কোনোমতে।

কিন্তু সেবার ভয়ংকর ঝড় এলো, উড়ে গেলো বুড়ির বাড়ির চালের আদ্ধেকটা। নতুন করে চাল না ছাইলেই নয়। কিন্তু টাকা কোথায়, কে দেবে টাকা ?

কোনো উপায় নেই, তাই অগত্যা বুড়ি ঠিক করলো, ভগবানের কাছে চাইবে টাকা। কী করে খবর পাঠাবে ভগবানকে ? বুদ্ধি খেলে গেলো বুড়ির মাথায়, পোস্টাপিস থেকে কিনে আনলো একটা পোস্টকার্ড, তারপর গোটা গোটা অক্ষরে তাতে লিখে দিলো—'হে ভগবান, দয়া করে আমাকে একশো টাকা পাঠিয়ো। বড়ো দরকার।'

লেখা তো হলো, কিন্তু ভগবানের ঠিকানা তো জানা নেই বুড়ির ! তবে কিনা, ভগবান তো খুব নামকরা লোক, ডাকপিওন নিশ্চই জানবে ওনার ঠিকানা। সেই ভরসায় চিঠির ঠিকানার জায়গায় বুড়ি লিখে দিলো, "ভগবান"।

ডাকপিওনের হাতে পড়লো চিঠি। ঠিকানা দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। এ যে ভগবানের কাছে চিঠি ! কে লিখলো, কী লিখলো, তা জানবার বড়ো কৌতূহল হলো পিওনের। চিঠিটা উল্টে দেখে, বুড়ি মিনতি করেছে একশোটা টাকার জন্য।

দেখে বড়ো করুণা হলো পিওনের। আহা বেচারা বুড়ি, একা একা কতো কষ্টে আছে, তার ওপর ঝড়ে ঘর ভেঙেছে, নিশ্চই টাকাটার বড়োই দরকার ! কী করা যায় ?

সবার বাড়িতে যায় পিওন, আর বলে, 'বুড়ির ঘর সারাবার জন্য কিছু সাহায্য করুন না ! সামান্য হোক, যা হোক কিছু পয়সা দিন। তবে একটা কথা, বুড়িকে বলবেন না যেন কথাটা। আমরা চাঁদা তুলছি জানলে বুড়ি নেবেইনা হয়তো টাকা।'

সকলে একটু একটু করে পয়সা দেয়, এই করে সব শেষে পিওন দেখলো, আশি টাকা উঠেছে মোট। মন্দ নয় নেহাত ! তখন সেই টাকা একটা খামে করে ভরে, ওপরে লিখে দিলো, "ভগবানের কাছ থেকে আসছে, বুড়ির জন্য চিঠি"। লিখে, সেই খাম বুড়িকে দিয়ে এলো—বললো, 'ও বুড়িমা, ডাকে চিঠি এসেছে আপনার।'

খাম খুলে তো বুড়ি আহ্লাদে আটখানা। এক শো পুরো না, আশি টাকা, তবু তা দিয়ে টেনেটুনে ঘর ছাওয়া হয়ে গেলো। পিওন আসতে যেতে দেখে, আর ভালো লাগে তার !

ভালোই আছে বুড়ি। কিন্তু সুখ বেশি দিন সয় ! সেবার শীত পড়লো প্রচণ্ড। একটা কাঁথার বড়োই দরকার হয়ে পড়লো। ভগবানের ওপর অগাধ বিশ্বাস বুড়ির, জানে তিনি তাকে বিমুখ

করবেন না, তাই আবার চিঠি লিখে দিলো একটা।

আবার পিওনের হাতে পড়লো সেই চিঠি। পিওন দেখে, তাতে লেখা, 'হে ভগবান, বড়ো শীত পড়েছে, কাঁথা কেনার জন্য তিরিশটা টাকা পাঠিয়ো। তবে এবার বাপু নিজে এসে টাকাটা দিয়ে যেয়ো। আগেকার সেই যে একশোটা টাকা চেয়েছিলাম, তুমি তো পিওনের হাত দিয়ে পাঠালে। পিওন ব্যাটা তার থেকে কুড়িটা টাকা সরিয়ে নিয়েছে, কী আর বলবো!'

কলকাতা

বিজন গঙ্গোপাধ্যায়

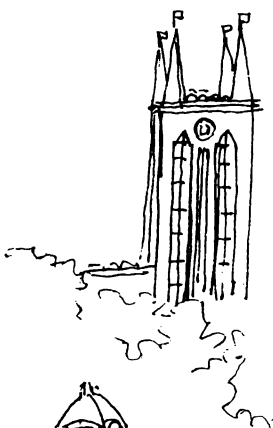

কলকাতা তুই, খোল খাতা তোর
দেখ খুঁজে তোর বয়েস ;
যে দিন তোকে জব চার্নক
করেছিলেন চয়েস !
অনেক কারিগরের ছোঁয়ায়
তোর যে প্রাচীন মূর্তি ;
পালটে গিয়ে করছে যে আজ
তিনশো বছর পূর্তি !
দেখেছিস কি আয়না নিয়ে
এখন আপন গড়ন ?

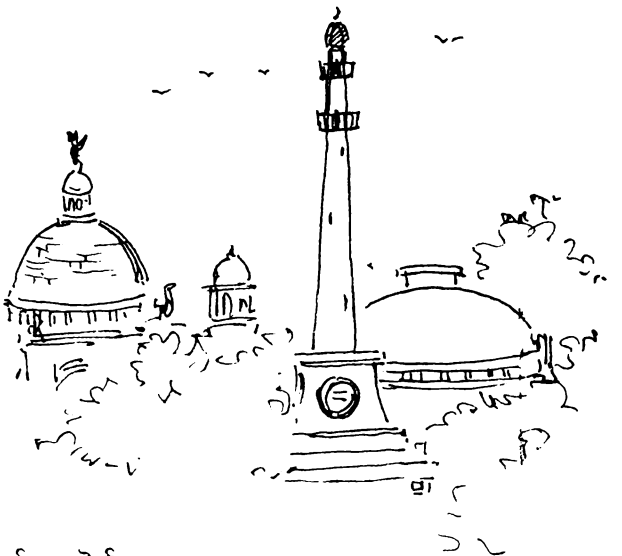

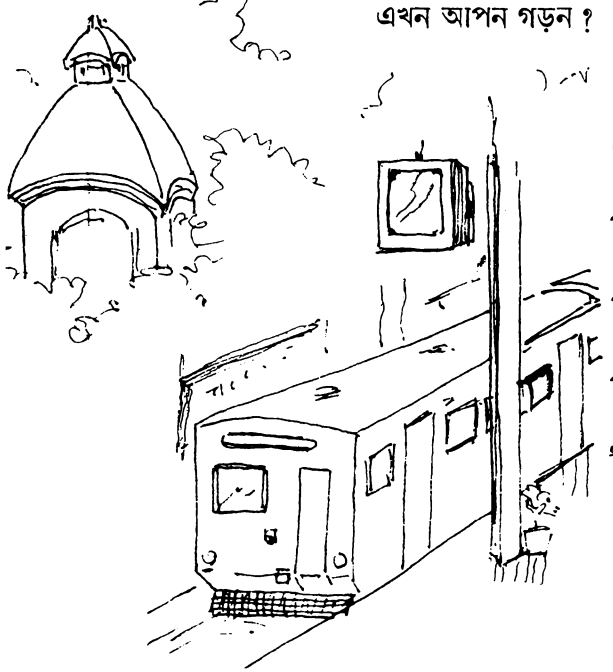

এখন কি তুই তিলোত্তমা
জিতলি জরা মরণ ?
পাতালে তোর পাতালবাসী
রেল ছোটানো শহর ;
পাল্লা দিয়ে ছুটছে পাশেই
গঙ্গা, তুলে লহর !
পালটে গেছে অনেক কিছুই
কিছু বয়েস খোয়ায় ;
কিছু আছে স্বপ্নরঙীন
জীর্ণ স্মৃতির ধোঁয়ায় !

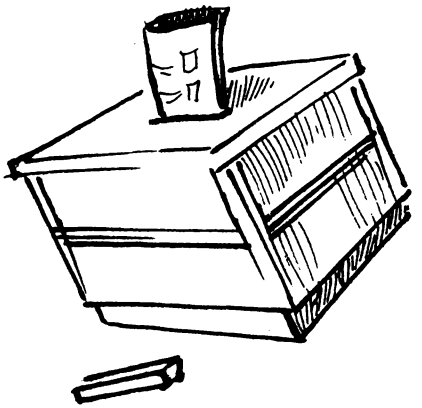

ঢোলভাঙ্গার ভোটবাবু

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ভৈসাঘাটের হাঁটুজল পেরিয়ে ভোটবাবুদের গরুর গাড়ি যখন ঢোলভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধারে দাঁড়াল তখন পশ্চিমের ঘন ঝোপঝাড়ে সূর্যটা অস্তে নামছে। পরদিন এখানে ভোট হবে। দশাসই মেজো ভোটবাবুর ভিজে কোঁচা থেকে টপটপ করে তখনও জল ঝরছে। উনি নেমেই গজগজ করতে লাগলেন, 'এর নাম ছপছপানি অল্প পানি? এতো ছোটখাট নদী!' দূরে জলে একটা পাঁউরুটি ভেসে যাচ্ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই চেঁচালেন, 'হ্যাঁরে দোলগোবিন্দ, পাঁউরুটিটা বাঁচাতে পারলি না।' সদ্য গোঁফ ওঠা ছোট্ট সাড়ে চারফুট সেপাই দোলগোবিন্দ তখন গরুর গাড়ি থেকে বিছানা মশারি কম্বল টেনে নামাচ্ছে। টানাটানিতে কোত্থেকে একটা ডিম সেদ্ধ মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল। সেটাকে ধরতে ছুটল। মেজোবাবু রেগেমেগে বিরাট চাদরটা ঝেড়ে ঝুড়ে ভাল করে ফের ঝপাৎঝপাৎ শব্দে গায়ে জড়ালেন। দু নম্বর সেপাই, রোগাসোগা নাড়ুগোপাল সেই চাদরে মেজোবাবুর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে হাঁকপাক করতে লাগল। ছায়ার মত লেগে থাকবে, এরকমই ট্রেনিঙে বলা আছে।

বিছানা বেডিং পাঁউরুটি ডিম কলা ভোটের বাক্স আর মালপত্তর সব একে একে নেমে গেল। জবুথবু হরেন হেমব্রমও নেমে এল ওর ভোটের কালি আর টিপছাপের সরঞ্জাম নিয়ে। শুধু বড় ভোটবাবু গোলগাল চেহারা নিয়ে গরুর গাড়িতে কানঢাকা টুপি পরে ব্যালট পেপার বগলে বসেই রইলেন। যতবার নামতে যান বাঁদিকের গরুটা ততবার বেদম শিং ঝাঁকায়। শেষে দিল-বাহাদুর জিৎবাহাদুর ওদের বন্দুক দুটো নামিয়ে রেখে গরু সামলে ধরাধরি করে নামাল ওঁকে। জলের ওপারে ভোটবাবুদের বাসটি লাল ধুলো উড়িয়ে ঝোপের আড়ালে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেল। তিন নম্বর লম্বা দাড়ি ভোটবাবু তখন কাগজপত্র ঘেঁটে চৌকিদারের নাম পড়ছেন। ওকে খুঁজে বের করে তেল আনিয়ে হ্যারিকেন জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামের ছেলেপিলের ভিড় ঠেলে দোল-গোবিন্দ আর নাড়ুগোপাল ইস্কুল ঘরের গোবর-ল্যাপা মেঝেয় সতরঞ্চি মেলে শোবার জোগাড় করতে লাগল। সেই দেখে বড়বাবুতো এই মারেন কি সেই মারেন। তিন নম্বর ভোটবাবু বললেন 'ওদের দোষ নেই স্যার। ভোটের ট্রেনিঙে রোজ ছ ঘণ্টা করে ছুট করিয়েছে। ঐতো রোগা চেহারা।' এই বলে একটা নড়বড়ে টেবিলে পা মুড়ে বসে ধূপ জ্বেলে উনি চোখ বুজে নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে মন দিলেন। বাইরের ছেলেপিলেগুলো জানালায় আর দরজার ফাঁকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল।

সকাল হলেই দলে দলে ঢোলভাঙ্গার মানুষজন আসবে ভোট দিতে। তাই সন্ধ্যের অন্ধকারেই

হৈ হৈ লেগে গেল। মেজোবাবু গ্রাম থেকে একটা বড় মোরগ বাছাই করে ফিরে এসে চৌকিদারকে রান্নার মেনু বোঝাতে লাগলেন। ইস্কুলের মেঝেয় দুমদাম শাবল পড়তে লাগল। বাঁশ পুঁতে, চট ঘিরে ভোটের গোপন কক্ষ তৈরি হবে। দিল-বাহাদুর জিৎ বাহাদুর বিশাল ভোজালি আর বন্দুক নিয়ে ব্যালট কাগজে আর দুটো ভোটবাক্স আগলে বসে রইল। বন্দুকের মুখে বল্লমের ফলাগুলো হ্যারিকেনের আলোয় ঝকমক করতে লাগল। বাইরে মেজোভোটবাবুর বাজখাঁই গলা শোনা গেল, 'এ্যাই ছেলেরা, যাও যাও বাড়ি যাও। আমরা যাত্রা করতে এসেছি নাকি?' ভিতরে তখন টুকটুক করে সেদ্ধ ডিম ছাড়াবার মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। বড়বাবু স্বয়ং হাত লাগিয়ে-ছেন। সেই শব্দে দোলগোবিন্দ আর নাড়ুগোপাল কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল। মেজোবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'উঁহু, ওসব হবে না। আগে ঝাঁট পার্ট দিয়ে আমাদের বিছানা পেতে মশারি টাঙ্গিয়ে দাও তারপর ডিম্ সেদ্ধ পাবে।' ওরা হতাশ হয়ে ঝাঁটা হাতে উঠে পড়ল।

আপেল, কলা, ডিম সেদ্ধ, পাঁউরুটি আর চৌকিদারের তৈরি ভেলিগুড়ের চা। এই দিয়ে টিফিন হল সবার। বাইরে তখন আলো নিবে ঘুরঘুট্টি হয়ে গেছে। চারদিক নিঃঝুম। ঠাণ্ডা নামছে জাঁকিয়ে। ভাঙ্গা দরজা দুটো আগলে বন্দুকধারী দুই বাহাদুর দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে বাবুরা বসে কাগজপত্র মেলাতে লাগলেন। ভোটের সরঞ্জাম সাজাতে বসলেন ঠ্যাং ছড়িয়ে। তিন নম্বর ভোটবাবু এসবের মাঝেই কি একটা ভূতের গল্প ফাঁদলেন। হ্যারিকেনের আলোটা কি রকম ফট ফট আওয়াজ করে শুধুশুধুই থরথর করে কাঁপতে লাগল। সবাই ব্যালট কাগজ, ভোট বাক্স, শীলমোহর ভুলে ঘন হয়ে বসল। মাটির দেওয়ালে ওদের ছায়াগুলো জড়াজড়ি করে দুলতে লাগল। বাইরে ডোবার জলে ঝপ্ করে কি একটা পড়তে ভীষণ চমকে উঠলেন বড়বাবু। দুটো একটা কুকুর কেঁদে উঠল অকারণে। আর তারপরই এবড়ো খেবড়ো মেঝের কোণে ভারী ভোট বাক্সটা হঠাৎ খটখট করে দুলে উঠল। বড়বাবু 'জিৎবাহাদুর কাঁহা' বলে ভয়ে নাড়ু-গোপালকে জাপটে ধরলেন। গল্প থেমে গেল। আধা অন্ধকারে সকলে নিঃশ্বেস বন্ধ করে চেয়ে রইল ঘরের কোণে। জিৎ বাহাদুর দিল বাহাদুর একমনে কখন গল্প শুনতে বসে গিয়েছিল। চমকে উঠে দূর থেকে টর্চ ফেলে সাবধানে বন্দুকের খোঁচা দিতেই বাক্সের আড়াল থেকে থপ থপ করে একটা ব্যাঙ বেরিয়ে ঘরের কোণে লাফাতে লাগল। বড়বাবু নাড়ুগোপালকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'শীতকালে তো শুনেছি ব্যাঙেরা ঘুমোতে যায়।' মেজবাবু বললেন, 'শীত আর পড়ল কই? দেখে আসি রান্নার কদ্দূর। চাটনিটা আবার আমি রাঁধব বলে এসেছি।'

ভয় পেয়ে সবার ক্ষিধে বেড়ে গিয়েছিল। খেয়ে দেয়ে ভরপেটে চাটনির প্রশংসা করতে করতে সবাই বাইরে এল মুখ ধুতে। তারপর ঘরে ঢুকেই সে কি হি হি কাঁপুনি সবার। শুধু মেজোবাবু নির্বিকার। হামাগুড়ি দিয়ে যে যার মশারি তুলে কম্বলের তলায় সেঁধিয়ে গেল। মেজো ভোটবাবু শুধু চাদরটা টেনেই শুয়ে পড়লেন বড়-বাবুর পাশে। বড়বাবু সব রকম গরম জামা এঁটে কম্বলের তলায় ঢুকে বললেন, 'আপনার শীত করে না সমাদ্দার মশাই?' মেজোবাবু হেসে বললেন 'আমার শীত বোধটা একটু কম। কষ্ট পাই গরমে। টাইগারহিলে সূর্যোদয় দেখেছি সিল্কের পাঞ্জাবি পরে।'

'বলেন কি!' বলে বড়বাবু কম্বলটা মাথা অবধি ঢেকে নিয়ে কাঁপতে লাগলেন।

তখন কত রাত কে জানে। ঘুম ভেঙ্গে গেল বড় ভোটবাবুর। গা হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা। কম্বলটা টানতে গিয়ে দেখেন সেটা কোথাও নেই। চারদিক হাতড়াতে লাগলেন। একটা হ্যারিকেন কখন নিবে গেছে। আর একটা জ্বলছে কোনমতে। আধো আলোয় টর্চটা হাতে ঠেকল। জ্বালতেই চোখে পড়ল তাঁর কম্বলটি মুড়ি সুড়ি দিয়ে মেজো

ভোটবাবু গভীর ঘুমে মগ্ন। এমনকি কান ঢাকা টুপিটাও কখন খুলে নিয়ে দিব্যি মাথায় চড়িয়েছেন। অন্ধকারে ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি করলেন। মেজোবাবু কেন, কারোরই ঘুম ভাঙ্গল না। উনি শুধু ঘুমের মাঝে বিশ্রী ঘড় ঘড়ে শব্দ করে কম্বলটা টেনে পাশ ফিরেলেন। বড়বাবু আর কি করেন। হামা টেনে পাশের মশারিতে ঢুকে পড়লেন। দোলগোবিন্দ আর নাড়ুগোপালের গায়ের চাপাটা টেনে হিঁচড়ে একটুখানি তুলে ধরে কোনমতে ঢুকে পড়লেন ওদের মধ্যে।

কিন্তু ঘুম হল না বেশিক্ষণ। তিন নম্বর ভোটবাবুর মন্ত্রের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসলেন বড়বাবু। চাদরের তলায় আর কাউকে পেলেন না। মেজোবাবুকেও দেখা যাচ্ছে না ধারে কাছে। অথচ বাইরে তখনও অন্ধকার। শুধু হরেন হেমব্রম কম্বল জড়িয়ে বসে বসে ঢুলছে। তিন নম্বর ভোটবাবু মন্ত্র থামিয়ে বললেন, 'চলুন চলুন এখুনি সূর্যোদয় হবে। ওঁ জবাকুসুম,' বড়বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আর সব গেল কোথায়?' এই সময় নাড়ুগোপাল আর তার পিছনে দোলগোবিন্দ কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল। নাড়ুগোপাল বলল, 'ডু-ডুব দেওয়া গেল না।' দোলগোবিন্দ বলল, 'ওরে বাবারে, উ হু হু হু।' তিন নম্বর ভোটবাবু বললেন, 'কি বোকারে, বললাম না একবার কোনমতে ডুব দিলে আর শীতই থাকত না।' ওরা দুজন এককোণে বসে কাঁপতে লাগল। বড়বাবু দেখেশুনে বললেন 'এসব কি হচ্ছে শ্রীচরণবাবু? শীতের রাতে চান?' তিন নম্বর বাবু তড়াক করে টেবিল থেকে নেমে এসে বললেন, 'আজ্ঞে শুধু চরণ। রাত কোথায় স্যার! এখুনি সূর্য উঠবে আর দেখবেন পিল পিল করে লোক আসবে ভোট দিতে। তখন আর নাইবার সময় পাবেন না। আরে আমার গামছাটা গেল কোথায়?

ঐ দেখ ওটা দিয়ে কে আবার মশারি বেঁধেছে।' তাড়াতাড়িতে হ্যারিকেন উল্টে ফেলে তিন নম্বর বাবুও অন্ধকারে উধাও হলেন। ভোটের কথা মনে পড়তেই বড়বাবুও উঠে পড়লেন।

বিছানা কম্বল তুলে, চুল আঁচড়ে যখন সবাই চায়ে চুমুক দিয়ে ভোটবাক্স নিয়ে বসেছেন, আর বন্ধ দরজায় ভোটারদের দুমদাম ঘা পড়ছে ঠিক তখনই আসল লোকটিকেই পাওয়া গেল না। সবাই ভাবতে লাগলো, তাই তো, বড়বাবু গেলেন কোথায়? মেজোবাবু ভয় পেয়ে হৈ চৈ লাগালেন, 'বাহাদুররা সব কাঁহা গিয়া?' দিল বাহাদুর পিঠ লাগিয়ে দরজা বন্ধ রেখেছিল। ডাক শুনে যেই সেলাম করে দাঁড়িয়েছে অমনি দড়াম করে দরজা খুলে গিয়ে হুড়মুড় করে তিন চারটে ছেলে বুড়ো আর একটা খুনখুনে বুড়ি মাটিতে গড়াতে লাগল। মেজোবাবু উত্তেজিত হয়ে সমানে হিন্দী বলতে লাগলেন, 'আরে ভোট আভি নেহি শুরু হুয়া, নিকালো।' তারপর দিল বাহাদুরকে চোখ লাল করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিলবাহাদুর কাঁহা?' দিল বাহাদুর ফের সেলাম ঠুকে জানাল যে, সেই দিলবাহাদুর। 'ও, তবে জিৎবাহাদুর কাঁহা?' বললেন মেজোবাবু। দিল বাহাদুর বন্দুক তুলে দূরে পশ্চিমের কুঁড়েগুলোর দিকে দেখিয়ে দিল। কে একজন মাতব্বর গোছের লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'বড়বাবু নাইছেন।'

মেজোবাবু আর তাঁর গায়ে লেপ্টে নাড়ু-গোপাল ছুটল ব্যাপার দেখতে। বাবলা ঝোপের শেষে কাঁকরের ঢালু জমি। সেখানে নামতে নামতে টাল সামলে সমান মাটিতে দাঁড়াতেই দেখতে পাওয়া গেল বড় বাবুকে। একটা ঝক-ঝকে কুয়োতলায় গায়ে তেল মেখে গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছেন আর চৌকিদার বালতি করে জল তুলে ওঁর মাথায় ঢালছে। একটু দূরে কুয়োর পাড়ে বন্দুকের বল্লম তুলে জ্বলজ্বলে চোখে বড়বাবুকে আগলে আছে দেহরক্ষী জিৎবাহাদুর। মেজোবাবু উত্তেজিত হয়ে অনেক কিছু বলতে যাবেন এমন সময় আর এক বিপত্তি। ভোটকেন্দ্র থেকে কি একটা হৈচৈ উঠল আর বাবলা ঝোপ ডিঙিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখা গেল দোলগোবিন্দকে। মেজোবাবু চেঁচালেন, 'আবার কি হলরে?' দোলগোবিন্দ চেঁচাল, 'ব্যালট কাগজ উধাও!' সেই শুনে বড়বাবুর আর চান শেষ হল না। ঐভাবে ছুটলেন ইস্কুল ঘরের দিকে। পিছনে পিছনে ঘটি হাতে চৌকিদার আর বন্দুক উঁচিয়ে জিৎ বাহাদুর।

ঢোলভাঙ্গার ইস্কুল ঘরে হৈ চৈ পড়ে গেল। সাইকেল মেসেঞ্জার বড়বাবুর চিরকুট নিয়ে সেক্টর আপিসে ছুটল। তাতে ইংরিজিতে লেখা ছিল, 'ব্যালট পেপার মিসিং।' ঘরের টেবিল চেয়ার কাগজপত্র তোলপাড় হল। তিন নম্বর ভোটবাবু ভয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কি একটা মন্ত্র পড়তে লাগলেন আর লম্বা দাড়িতে গিট পাকাতে লাগলেন। দিল বাহাদুর জিৎ বাহাদুর শূন্যে বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়তে যাবে এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে রব উঠল, 'পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে!' হরেন হেমব্রমের চাদরে যত্ন করে বাঁধা ছিল ব্যালটের বাণ্ডিলটা। ও ওটাকে কাল বালিশ করে শুয়েছিল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বড়বাবু ভিজে গা মুছতে মুছতে দরজা ফাঁক করে হাঁকলেন, 'বন্ধুগণ, ভোট নেওয়া শুরু হল।'

গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে গ্রামের মানুষজন নামছে ভোট দিতে। দোরের বাইরে সাপের মত লাইন দাঁড়িয়ে আছে এঁকেবেঁকে। সবাই আগে ভোট দিতে চায়। হৈ চৈ, ঠেলাঠেলি। এরমধ্যে জলকাদা মেখে ভিড় ঠেলে সেক্টর অফিসার হন্তদন্ত হয়ে ভোটকেন্দ্রে ঢুকলেন। সঙ্গে গুটিকয় পুলিশ। বললেন, 'এই যে শুনলাম ব্যালট পেপার চুরি গেছে?' বড়বাবু একগাল হেসে বললেন, 'বসুন, বসুন শান্ত হয়ে। চা খান।' সেক্টর অফিসার বসলেন না। রেগেমেগে গজগজ করতে করতে পুলিশ নিয়ে ফের ছপছপিয়ে জল পেরিয়ে জীপ গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন।

বেশ নির্বিঘ্নে ভোট চলছিল, হঠাৎ কে এক

নিবারণ গোপ এসে ঝঞ্ঝাট বাঁধাল। বাপের নাম জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'আনোয়ার।' চেপে ধরতেই খানিকটা কি ভেবে বলল, 'না না, নিরঞ্জন।' এমন লোককে ভোট দিতে দেওয়া যায় কিনা আলোচনা চলছে এমন সময় চৌকিদার একটা আস্ত পাঁচ কেজির জ্যান্ত রুই মাছ বুকে জাপটে ধরে ঘরে ঢুকল তার ল্যাজের জলের ঝাপটায় কাগজপত্র, বড়বাবু সবাই ভিজে গেল। মেজোবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, সবটাই হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ দুবেলাই, ভাজা, ঝোল, দুটোই, যাও যাও!' চৌকিদার তাড়া খেয়ে এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরময় কাদায় কাদা। এই ফাঁকে সেই নিবারণ গোপ, আসল নাম কিনা কে জানে, ভোট দিয়ে পালাল। ভোটের কালি মাখাবার জন্য হরেন হেমব্রম তখন তাকে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছে।

একপ্রস্থ চা পাঁউরুটি হয়ে গেছে। তবু বেলা বাড়তেই সবাই উসখুস করতে লাগল। বড়বাবু উঠে চৌকিদারকে খোঁজাখুজি করতে গিয়ে দেখলেন ঘরের পিছনে বিশাল ধামায় মুড়ি মাখা হচ্ছে। যে লোকটা মুড়ি মাখছিল সে বলল, 'এই যে স্যার, রেডি হয়ে এল।'

মুড়ির বাটি কম পড়ে গেল। জিৎবাহাদুর দিল বাহাদুর খাবে কিসে? বড়বাবুই বুদ্ধি বাতলালেন। বললেন, 'ওদের অত বড় বড় টুপি, ওতেই দিয়ে দাও।' ওরা একটা ঢিপিতে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। চৌকিদার ধামা হাতে ওদের কাছে গিয়ে বলল, 'টুপি খোল।' ওরা বুঝতেই পারে না কেন টুপি খুলতে হবে। যখন শুনল বড়বাবুর অর্ডার তখন বগলেশ টেনে হিঁচড়ে টুপি খুলে ফেলল। চৌকিদার হুড়হুড় করে মুড়ি ঢেলে দিল।

ভর দুপুরে ভাত নামল। মেজোবাবুর আর তর সইছিল না। মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। বাইরে এসে দেখেন পাঁচজন ভোটার। দুজনকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এখনো গোঁফ ওঠেনি ভোট দিতে এসেছ? যাও!' বাকি রইল তিনজন। তাদের বললেন, 'সব চানটান করে খাওয়া দাওয়া সেরে বেলা পড়লে এসো। এখন যাও। আরে আমরা তো পালিয়ে যাচ্ছি না।' ভিতরে এসে দোলগোবিন্দ নাড়ুগোপালকে কাজে লাগিয়ে চেয়ার টেবিল সরিয়ে মেঝেতে সার বেঁধে কলাপাতা পাতার ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভাজাভুজি, চার রকম তরকারি আর জ্যান্ত রুইয়ের ঝোল। চৌকিদার সব ব্যবস্থা করেছে। ঢোলভাঙ্গার বদনাম না হয়।

খাওয়া দাওয়ার পর কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। দোলগোবিন্দর ঠেলাঠেলিতে বড়বাবুর ঝিমুনিটা ছুটে গেল।

'বাবু, ভোটার এসেছে।'

ব্যালট কাগজে সই করে, লিস্টে নাম মিলিয়ে, হেমব্রমকে জাগিয়ে আঙুলে ছাপ মারিয়ে এক-জনের ভোট নিয়ে আবার সবাই ঝিমিয়ে পড়ল। মেজোবাবু চোখ বুজেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'চরণবাবু, আর কজন বাকি?' তিন নম্বর ভোটবাবু হাইতুলে লিস্টে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'জনা দশেক।'

'সাড়ে চারটেয় ঝাঁপ বন্ধ, মনে থাকে যেন। এই বলে মেজবাবু কাত হলেন।

ভোট শেষ হতে না হতেই ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল। আবার হ্যারিকেন জ্বলল। ভোটের বাক্স গালা দিয়ে শীলমোহর করে কাপড় জড়ানো হল। সব কিছু গুছিয়ে সবাই যখন হাঁফ ছাড়ছে তখন জলের ওপারে বাসের হর্ন শোনা গেল। পাথরভাঙা গ্রামের ভোট বাবুদের তুলে নিয়ে বাস এসেছে ঢোলভাঙ্গায়। এপারে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে জল পেরিয়ে দেবার জন্য।

চৌকিদার এসে মেজোবাবুর কাছে দাঁড়াল 'স্যার মাছ ভাজার তেল আনতে যাব, পয়সা দিন।' মেজবাবু পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ ভাল করে ভাজবে। আর শোন, ভাতটা তাড়াতাড়ি বসাও। দেখছ তো বাস দাঁড়িয়ে আছে।'

চারদিক নিঃঝুম হয়ে গেল। শীতটাও পড়ল আগের রাতের মত জাঁকিয়ে। ওদিকে বাসের মধ্যে শ্রান্ত ক্লান্ত ভোট বাবুরা অস্থির হয়ে উঠলেন। ওঁদের একজন বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো এদের? ভোটতো কখন শেষ হয়ে গেছে! ও ড্রাইভার হর্নটা বাজাও না জোরে।'

নিস্তব্ধ রাত চিরে ঝাঁ ঝাঁ করে বিকট হর্ন বাজল। পাথরভাঙ্গা ভোট বাবুদের কাছে খবর এল, 'ভাত চেপে গেছে। মাছ ভাজা হচ্ছে। এপারের ভোট বাবুরা খাওয়া-দাওয়া সেরেই বাসে উঠবেন।'

এই না শুনে পাথরভাঙ্গার ভোট বাবুরা চটে আগুন হয়ে বললেন 'অ্যাঁ, রাতের খাওয়া-দাওয়া! থাকুক পড়ে ওরা। আমরা চললাম। এ্যাই ড্রাইভার, স্টার্ট লাগাও।'

আরো দু একবার হর্ণ বাজিয়ে বাস ফিরে গেল ঢোল ভাঙ্গার ভোটবাবুদের না নিয়েই।

সেকটর অফিসার কাগজ মিলিয়ে বললেন, 'এই বাসে সব কটা পার্টি ফিরে গেল অথচ ঢোল ভাঙ্গা পার্টির খোঁজ নেই।' আপিসের কে একজন বলল, 'স্যার ওদের নাকি মাছ ভাজা হচ্ছে।' সেকটর অফিসার রেগে কাঁই হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভোটের বাক্স জমা করার নাম নেই, রাত দুপুরে বনবাদাড়ে ফিস্টি হচ্ছে!' তারপর জনা কয়েক পুলিশ ডেকে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে। সেই ঝামেলা পার্টির কাণ্ড, যাদের ব্যালট পেপার উধাও হয়েছিল। শোন, ঢোল ভাঙ্গায় গিয়ে ভোট পার্টির যে যেখানে যেমন আছে তেমনি সব জিপে তুলে নেবে। কোন কথা শুনবে না।' এই বলে সেক্টর অফিসার নিজেই স্টিয়ারিঙে বসলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভৈসা ঘাটের ওপারের

ঝোপ ঝাড় আলোয় ঝকমক করে উঠল। গোঁ-গোঁ করতে করতে সেক্টর আপিসের জীপ জলের সামনে দাঁড়াল। সেক্টর অফিসার জলের মধ্যেই গাড়ি নামিয়ে দিয়ে এপারে চলে এলেন। বড়বাবু মেজোবাবু সমেত ভোটের পুঁটলি, বাক্স, লোকজন সব পুলিশ দিয়ে জীপে তুলে আবার জলে নামলেন। জীপ যখন ধীরে ধীরে জল পেরোচ্ছে তখন বড়-বাবুদু মুঠোয় দুটো মাছ ভাজা নিয়ে ভাত লাগা এঁটো হাতটা চাটছেন। আর মেজোবাবু একটা মাছ কাঁটাশুদ্ধ মুখে পুরে অন্য হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে একটা মাছ ভাজা বের করে সেক্টর অফিসারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছেন, চাখবেন নাকি স্যার, এখনও গরম আছে।'

মনে মনে

তাপস রায় চৌধুরী

এই যে আমার নৌকোখানা
আমিই নাওয়ের দাঁড়ি,
এ নৌকোতে রোজ আমি দিই
সপ্ত সাগর পাড়ি।
দাঁড় টেনে যাই উথাল পাথাল
দুধের সাগর পারে,
ব্যাঙমা আর ব্যাঙমীদের
বন ছেড়ে বাম ধারে
এগোই খানিক, পৌঁছিয়ে যাই
দত্যি রাজার দেশে,
গা' ছম্-ছম্. ডাইনে ফিরে
পাল তুলে যাই ভেসে।
ক্ষীরের সাগর পেরিয়ে আসি
তেপান্তরের মাঠে,
নোঙর ফেলে, বাজিয়ে বাঁশি
খানিক সময় কাটে।
আবার চলা, মৌ-এর সাগর
যেই পেরিয়ে যাওয়া,
অমনি যাবে ফুলের দেশে
ফুল-পরীদের পাওয়া।
তপ্ত ঘি-এর সাগর ছেড়ে
হিমের সাগর গেলে,
হিম-বুড়ো আর আগুন পাখীর
অমনি দেখা মেলে
চরকা বুড়ির ঘর দেখা যায়
পাড়ের খানিক দূরে,
নৌকো আমার যখন ভাসে
জ্যোৎস্না-সমুদ্দুরে।
রাম ধনুকের সাতটা রঙের
ঢেউ এর সাগর বেয়ে
তর-তরিয়ে যাই ভেসে ভাই
খুশীর নাওয়ের নেয়ে।
সেই সাগরে খুশীর তুফান
যখন তখন চলে
খুশীর ঢেউ এর মাথায় মাথায়
খুশীর মানিক জ্বলে।
কাগজ-মোড়া নৌকো নিয়েই
সাত সাগরে ভাসি,
মনে মনেই যাই ভেসে. ফের
মনে মনেই আসি।।

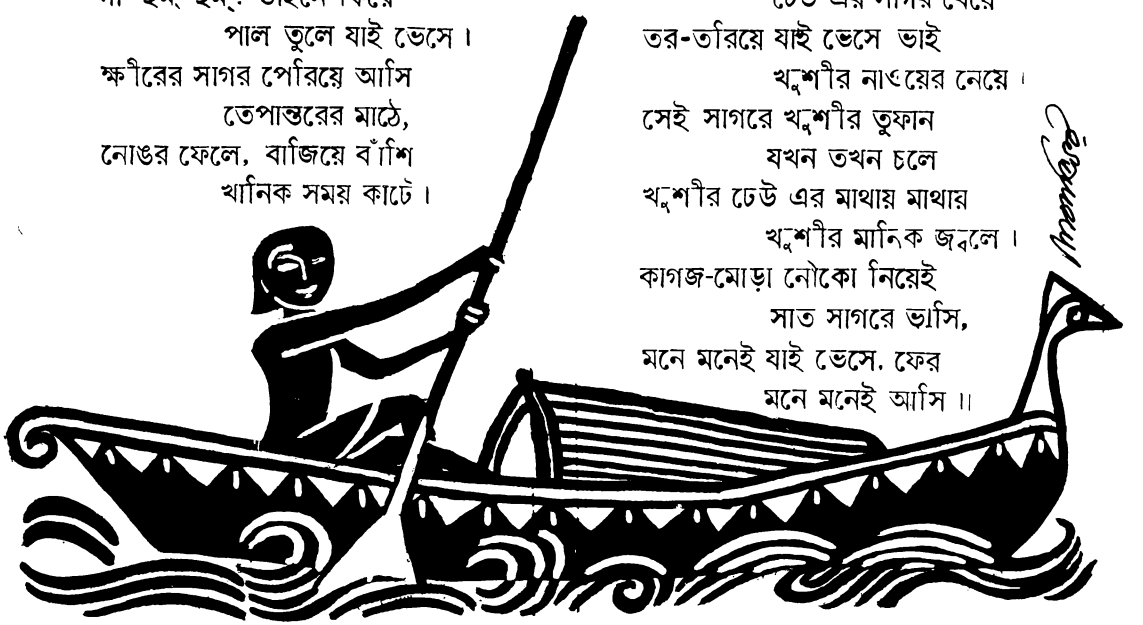

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু

কালাচাঁদ কতগুলো ছবি এঁকেছিল ; পাগলা দাশুর সেগুলো ভারি পছন্দ ! ঝটপট সেগুলো নকল করে নিল ও। একেবারে হুবহু নকল ! কিন্তু প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলকে দেখাতেই উনি বললেন, 'এ কিহে ! এক একটা ছবিতে অনেকগুলো করে ভুল !' দাশু দেখল ভাল করে, —তাইতো !

একটা ছবি আমরা ছাপলাম। বাঁদিকেরটা কালাচাঁদের আঁকা, ডান দিকেরটা দাশুর। বলতে পারো, ভুলগুলো কী কী ?

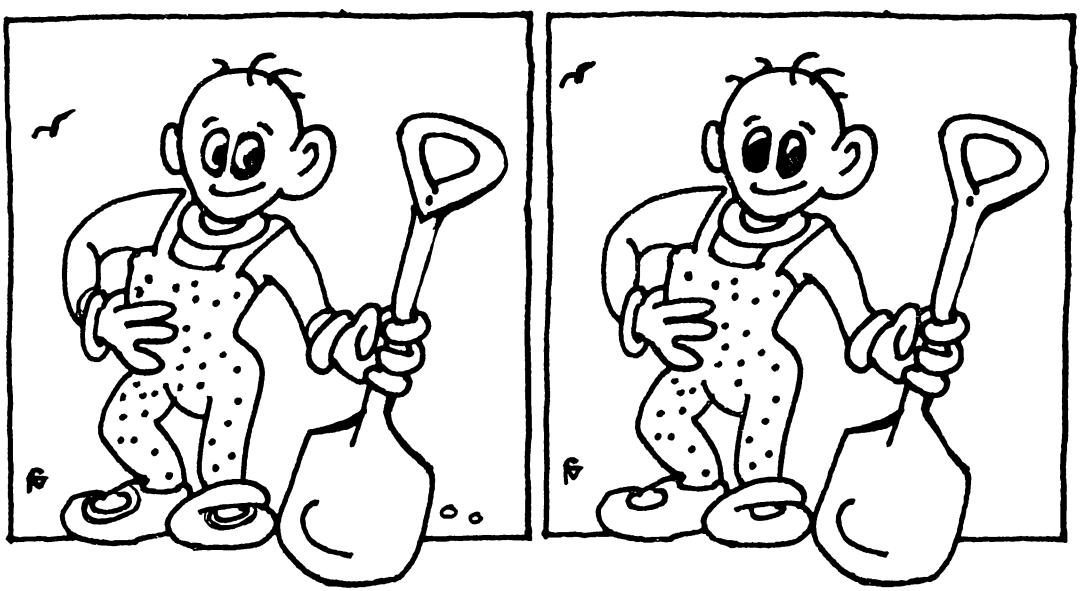

দাশু বলল, 'ওমম টাকেন চ চা ? ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐?
প্রোফেসর বললেন, 'বাচাল দুবের হা !' ☐☐☐☐☐☐☐!
কে কী বলল বুঝলে ?
না বুঝলে ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ

তেরো নম্বর ঘরের বাসিন্দা

শচীন্দ্রনাথ বসু

'হ্যাঁ, অসংখ্য হিংস্র জন্তুর কথা তো আমরা সবাই জানি,' বলছিলেন অধ্যাপক উমেশ সোম, 'কিন্তু উদ্ভিদরাও যে মাংসাশী ও ভয়ংকর হতে পারে তার খবর আমরা ক'জনে রাখি। ম্যাথিউ হকবার্গ আর ক'টি হয় ?'

পরিবেশটা এই ধরনের গল্পের উপযুক্ত বটে। আমরা কয়েকটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ছাত্র অধ্যাপক সোম ও তাঁর অধীনস্থ ডঃ চিরঞ্জিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে কলকাতা থেকে শিলং শহরে বেড়াতে এসেছি। হোটেলের দোতলায় পাশাপাশি অনেক-গুলি ঘর। সামনে কাচ-ঢাকা টানা বারান্দা। দুটি ঘর নিয়ে আছি আমরা। সে দিন সন্ধ্যা থেকে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে, কাচের গায়ে জলের ফোঁটাগুলি গড়িয়ে নামছে। তার ও-পারে সব ঝাপসা, শুধু বাড়িতে বাড়িতে আলোর বিন্দুগুলি মিট মিট করছে। বৃষ্টির জন্য

বেড়াতে বার হতে না পেরে ঘরবন্দী সকলে উশখুশ করছি, কিন্তু ভয়ংকর গাছপালার রোমাঞ্চ দেখতে দেখতে আমাদের পেয়ে বসল।

অধ্যাপক বলে চললেন, 'অবশ্য এ সব গাছপালা নিয়ে গাঁজাখুরি গল্প অনেক রটেছে, কিন্তু সে সব বাদ দিয়েও ভীতিকর উদ্ভিদ আছে পৃথিবীর নানা জায়গায়, যারা শুধু জল আর বাতাস থেকে সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্য বানায় না, ঐ গ্লুকোজ তো কেবল চিনি, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রোটিনও তারা সংগ্রহ করে কীট পতঙ্গ, এমন কি বৃহত্তর প্রাণীদের খেয়ে। বিশ্বাস না হয় হকবার্গকে চিঠি লিখে দেখ।'

'হকবার্গ কে সার? নিশ্চয় খুব নামকরা বিজ্ঞানী,' প্রশ্ন করলে অনিল।

'না হে না, এই ১৯৯০ সালে তার বয়স মাত্র ১৭, সেও তোমাদেরই মত ছাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে সে মাংসাশী উদ্ভিদ সম্বন্ধে এত শিখেছে যে যারা নিউ ইয়র্ক বটানিক গার্ডেনের থেকে ঐ বিষয়ে জানতে চায় তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় ব্রংক্স হাইস্কুল অব সায়ানসের এই ছাত্রটির। এই ধরনের কয়েক হাজার উদ্ভিদ আছে তার বাড়িতে। হকবার্গ ছাড়াও জার্মেনি, ইংল্যাণ্ড, অসট্রেলিয়া, ব্রেজিল ইত্যাদি দেশে সংগ্রাহক আছে, আছে আন্তর্জাতিক মাংসাশী উদ্ভিদ সমিতি এবং বীজ ব্যাংক, সেখান থেকে বীজ আনিয়ে তোমরাও, ঐ সব উদ্ভিদ গজাতে পার।'

'এবার এই গাছপালা সম্বন্ধে কিছু বলুন না সার।' অনুরোধ সিধুর, কিন্তু আমরা সকলেই তাতে সায় দিলাম।

ডঃ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'তুমি তো এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করেছ, তুমিই আরম্ভ কর না।' শুনে তিনি খুশি হলেন মনে হল, সিগারেট ধরিয়ে তাতে লম্বা টান দিয়ে শুরু করলেন, 'ব্রেজিল, বোর্নিও এবং আরও নানা দেশের গভীর ঘন জঙ্গলে কত অজানা মারাত্মক তরু লতা আছে কে জানে, কিন্তু বর্তমানে নিঃসন্দেহে প্রথম পুরস্কারটা পাবে বোর্নিওর কিনাবালু গিরির বাসিন্দা নেপেন্থেস রাজা। সে যে কীট পতঙ্গ ছাড়া ব্যাং, ইঁদুর এমন কি ছোট পাখি পর্যন্ত ধরে খায় তার লিখিত সাক্ষ্য আছে। আর গুজব বলে, বৃহত্তম মাংসাশীদের অন্যতম এই উদ্ভিদ বড় জন্তুও আত্মসাৎ করে।'

'শুনে মনে হচ্ছে ওরও দাঁত আছে জন্তুদের মত,' বললে সুশান্ত।

'না, তার দরকার করে না। নেপেনথেস এক রকম ঘট-তরু, এদের পাতার ডগা সরু ঘটের আকার নেয় বলে ঐ নাম। এই পাত্রের ভিতরটা নিম্নমুখী রোঁয়ায় ঢাকা। ঘটে যে জল জমে তাতে নিঃসৃত হয় আঠালো মিষ্টি বস্তু, তার এবং গন্ধের আকর্ষণে পোকারা ছুটে আসে। পেট ভরে খেয়ে কিন্তু ঐ রোঁয়া পেরিয়ে আর বার হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জলে পড়ে, সেখানে যে সব হজমি এন্‌জাইম আছে তারা বন্দী শিকারের দেহ গলিয়ে ফেলে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের দেহেও যে এই অত্যাবশ্যক রাসায়নিক আছে তা তোমরা জান। পোকাকে বোকা বানাতে এক রকম ঘটের জায়গায় জায়গায় প্রায় স্বচ্ছ ছোপ আছে, বন্দীরা তা জানালা ভেবে বৃথা পালাতে চেষ্টা করে।

'ঘট-তরুদের ফাঁদ যদি হয় অদ্ভুত আকৃতির পাতা, তো সুপ্রসিদ্ধ 'ভিনাসের মাছি ধরার ফাঁদ' (Venus's flytrap) আর এক আশ্চর্য পাতা। সেটা মাঝখানে কবজার মত ভাঁজ করা, এক এক অর্ধে আছে তিনটি এমন লোম যে পর পর দুটিতে যদি ২০-৪০ সেকেনডের মধ্যে পোকার গা ছুঁয়ে যায়, অথবা একই লোমে দু বার, তা হলে পাতার দুই অর্ধ বন্ধ হয়ে বন্দী করে পোকাকে। প্রথম স্পর্শে পাতার ভিতর দিয়ে এক বৈদ্যুতিক সংকেত চলে যায়, দ্বিতীয় ছোঁয়ায় বাইরের কোষগুলিতে জল ঢোকে যার ফলে পাতা ঝুঁকে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। পাতার দুই প্রান্তে আছে সারি সারি কাঁটা, আমরা যদি আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে হাত বন্ধ করি তা হলে যেমন হয়

সেই রকম অবস্থা। 'হাত' দুটি পোকাকে ক্রমশ জোরে চাপে পাতার গায়ে, তখন এনজাইমের সাহায্যে গাছ তার পুষ্টি সংগ্রহ করে, পাতা আবার খুলে যায় পরবর্তী শিকারের অপেক্ষায়। এই আশ্চর্য লোমগুলি সজীব ও নিষ্প্রাণের মধ্যে পার্থক্য বোঝে, লাঠি বা নুড়ি ছোঁয়ালে তারা কাজ করবে না।'

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি চলেছে। বারান্দার দিকে তাকিয়ে ডঃ বিশ্বাস হঠাৎ থেমে গেলেন—কে যেন অন্ধকারে বারান্দায় পায়চারি করছে। পরনে পাজামা, গায়ে শাল জড়ানো। গলা নামিয়ে বললেন তিনি, 'মনে হয় ১৩নং ঘরের বাসিন্দা, ঘর সর্বদা বন্ধই থাকে, কাল হঠাৎ একটুখানি দেখেছিলাম—মুখের ডান দিকে কপাল থেকে গাল পর্যন্ত একটা গভীর কাটা দাগ।'

শুনে সকলে স্তব্ধ, অধ্যাপক সোম একটা বই খুলে খুব মনোযোগে পড়ছিলেন, কথাগুলি শুনতে পেলেন বলে মনে হল না।তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, চিরঞ্জিৎ যে দুটি উদ্ভিদের কথা বললে, মাংশাসীদের মধ্যে তারা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেও ঐ দলে আরও অনেকে আছে, বিচিত্র তাদের শিকার ধরবার কৌশল। জল ও স্থলের উদ্ভিদ ব্লাডারওয়র্টেরও আছে স্পর্শসচেতন লোম, তাতে পোকার ঠেলা লাগলে শাখার ডগায় গোলাকার ব্লাডারের ঢাকনা খুলে যায়, নিমেষে ভিতরের টানে পোকা ফাঁদে পড়ে এবং ঢাকনা বন্ধ হয়। বাটারওয়র্ট ও সানডিউর আছে আঠালো ফাঁদ, সানডিউর পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ষিকায় ঢাকা, তাদের মাথায় আঠার ছোট ছোট ফোঁটা, তাতে আটকে পড়ে পোকা, তখন পাতার প্রান্ত মুড়ে তাকে ঘিরে ফেলে। এ ভাবে বড় প্রজাপতি পর্যন্ত মারা পড়ে।

'বাড়িতে একটা জলের পাত্রেও সানডিউকে পোষা যায়, ছোট ছোট মাংসের টুকরো খেতে দিয়ে। ডারুইন লক্ষ করেন এই উদ্ভিদ ছোট্ট পাতাগুলির আঠালো কর্ষিকার সাহায্যে পোকা আটকাল এবং কাছাকাছি কর্ষিকা নুয়ে পড়ে তাকে পাতার গায়ে চেপে ধরল, সেখানে এনজাইম হজমের কাজটা সম্পন্ন করছে। ডিমের সাদা অংশের বা মাংসের ছোট খণ্ডও সানডিউ একই ভাবে খেয়ে ফেলে। এ ছাড়া মাংসাশীদের মধ্যে পিংগুইকুলা, ডার্লিংটনিয়া, টিজেল ইত্যাদিরও নাম করা যায়।'

হোটেলে বলা ছিল, ততক্ষণে চা ও গরম গরম সিঙ্গাড়া এসে গিয়েছে। অচেনা ব্যক্তিটি যেন পায়চারি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে থেমেছে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে ঘরের দিকে পিছন ফিরে। তা দেখে সকলে মুখ চাওয়াচাউই করলে। একটু পরে অধ্যাপক গলা উঁচিয়ে বললেন, 'ভিতরে আসুন না, আমাদের সঙ্গে চা খান, আলাপ পরিচয় হক।'

মানুষটি ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পা বাড়িয়েছে এমন সময়ে ঘর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল—এমন এ শহরে প্রায়ই ঘটে। অধ্যাপক তাড়াতাড়ি মেঝেতে টর্চের আলো ফেললেন, তারই সাহায্যে আগন্তুক ঘরে ঢুকে বিছানার এক পাশে পা তুলে বসলেন। চা সিঙ্গাড়া তার দিকে এগিয়ে অধ্যাপক নিজের ও অন্যান্যদের পরিচয় দিলেন, তার পর বললেন, 'আপনিও কি বেড়াতে এসেছেন? আপনার নাম?'

ভদ্রলোক শুধু দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'হোটেলের খাতায় ১৩নং ঘরের বাসিন্দার নাম লেখা আছে রাম রহিম।' বাংলা কথাগুলির মধ্যে স্পষ্ট অবাঙালি সুর কানে এল।

ঘরে ঢুকল হোটেলের ছোকরা চাকর কতগুলি সরু মোমবাতি হাতে নিয়ে, টেবিলে দুটি জ্বেলে রেখে বেরিয়ে গেল সে। ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল আগন্তুক চায়ের পাত্রে চুমুক দিচ্ছেন, কিন্তু চেহারার বেশি কিছু স্পষ্ট হল না, মুখের কাটা দাগও না।

ভদ্রলোকের দেশ কোথায় তা অনেকের জানতে ইচ্ছা করলেও ঐ অল্প কয়েকটি কথা শুনে কেউ আর মুখ ফুটে সেই প্রশ্ন করলে না। ঘরের অস্বস্তি কাটাতে অধ্যাপক আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'মাংসাশী গাছপালার কথা

ছেড়ে দিলেও আমার মনে হয় উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু জানতে বাকি আছে, দরকার আরও কয়েকটি জগদীশ বোস। তরু লতার উপর নানা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তিনি যা দেখেছেন তাতে মনে হয় যেন তাদের স্নায়ু আছে। আসলে তো তা নেই, কিন্তু বিলাতের বড় বড় বিজ্ঞানী তাঁর পরীক্ষাগুলি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।'

সুশান্ত বললে, 'সে দিন পড়ছিলাম নিউ ইয়র্কের ক্লাইভ ব্যাক্‌সটার নামে এক ব্যক্তির পলিগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষার কথা। এই যন্ত্রে মনের আবেগ ধরা পড়ে, যেমন কোনও অপরাধী ধরা পড়বার ভয়ে মিথ্যা কথা বললে যন্ত্রের কাগজে যে রেখা পড়বে তাতে তার নির্দেশ পাওয়া যাবে। ব্যকসটার এই যন্ত্র একটি উদ্ভিদের সঙ্গে জুড়ল, তার পর একটি পাতা পোড়াবার কথা মনে মনে ভাবতেই দেখল ঐ রেখা লাফ মেরে উপরে উঠছে।'

অনিল বললে, 'আমি এও পড়েছি যে ইংল্যাণ্ডের এক প্রতিষ্ঠানের বাগানের গাছের সঙ্গে বিদ্যুতের ইলেকট্রোড জুড়ে দিলে উদ্ভিদের যখন জল দরকার তখন লাউডস্পিকারের কাতর ধ্বনি তা জানিয়ে দেয়। এ সবই আজগুবি মনে হয়। না সার?'

অধ্যাপক হেসে বললেন 'হ্যাঁ, যেমন মাদাগাস্কারে নাকি মানুষখেকো গাছ আছে, তাদের নিয়ে একটা গল্পের বই লেখা হয়েছে।'

'কথায় বলে গল্পের চেয়েও আশ্চর্য হয় বাস্তব,' শোনা গেল নবাগত ব্যক্তিটির গলা। 'সে রকম ঘটনা আমার জানা আছে—মাপ করবেন, বাইরের থেকে আপনাদের কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে, কিন্তু আমি যে গাছের কথা জানি তার তুলনায় ঐ নেপেনথেস বা ভিনাসের ফাঁদ কিছুই না।'

সবাই অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে, অবশেষে আমরা কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলাম, 'বলুন না, শুনি।'

রাম রহিম মুখ খুলবার আগেই আকাশ চিরে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় আওয়াজে সকলে চমকে উঠলাম। বিদ্যুতের ঝলকানিতে এক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ল মুখের সেই কাটা দাগ, দেখে শিউরে উঠলাম সকলে।

গল্প শুরু করবার আগে ঐ বজ্র বিদ্যুৎ কি বক্তাকে সাবধান করে দিল? তিনি তা অগ্রাহ্য করে আরম্ভ করলেন, 'কর্ম সূত্রে আমাকে নানা দেশে ঘুরতে টুরতে হয়েছে, একবার ব্রেজিলের সাও পাউলো শহরে আলাপ হয়েছিল রিকার্ডোর সঙ্গে। তার পেশা হাজার মাইলেরও বেশি উত্তরে অ্যামাজন নদীর ধারে গভীর জঙ্গল থেকে বিরল বা অজানা জাতের ফুল বীজ চারা সংগ্রহ করে বিদেশে চালান দেওয়া। এই জঙ্গল বিশ্ববিখ্যাত, আপনারাও নিশ্চয় জানেন, সারা বছর প্রচুর বৃষ্টি পেয়ে ঘন হয়ে গাছগুলি আকাশ ছুঁয়েছে আলোর লোভে, দিনের বেলায়ও নিচটা প্রায় অন্ধকার। শুধু এখানে সেখানে আলো আঁধারের নকশা।

'এক দিন রিকার্ডো জঙ্গলে ঢুকেছে এক সঙ্গীকে নিয়ে—কি যেন নাম তার, ধরা যাক রোমেরো—হাতে ভারী ধারালো দা বা ম্যাচেটে, তাই দিয়ে লতা ডাল কেটে পথ করে চলেছে তারা। ঠিক এই দিকটায় আগে কখনও আসে নি রিকার্ডো, কিন্তু দূর থেকে কি একটা অপরিচিত গন্ধ আকর্ষণ করছে তাকে। ফুলের গন্ধ কি? অজানা ফুল হলে তো অনেক দাম পাওয়া যাবে। কিন্তু শুধু পয়সা নয়, ঐ গন্ধের মাদকতাও যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। জঙ্গলে চলবার জন্য হাঁটুর নিচ পর্যন্ত খাটো পাজামা পরনে, তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে লতা পাতা জড়িয়ে যাচ্ছে, কাঁটা ফুটছে পায়ে, মাথা ঠুকছে ডালে, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

'এক জায়গায় একটু মোটা এক ডালে ম্যাচেটে দিয়ে ঘা মারতেই ডালটা সহজে কেটে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল এক দল কি যেন। আলো আঁধারের মধ্যে নজর করে প্রথমে চোখে পড়ল ড্যাব ড্যাব করছে অনেকগুলি গোল হিংস্র চোখ—মস্ত মস্ত মাকড়সা, আটটি মোটা মোটা পায়ে খাড়া হয়ে দেখছে তাদের, সারা গায়ে ঘন কালো লোম! মুহূর্তে তারা লাফ দিল মানুষ দুটির দিকে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গা থেকে ওদের ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে দু জনে তো দে ছুট, মাথায় দেহে কত যে আঘাত লাগল তার ঠিক ঠিকানা নেই। অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এক জায়গায় থেমে তারা নিজেদের হাত পা মুখ পরীক্ষা করলে—নানা অঙ্গে লোম লেগে আছে, কিন্তু মাকড়সা নেই বলে মনে হল।

"ডালের ভিতর মাকড়সার বাসা, এমন তো কখনও শুনিনি। তাও কি বিরাট আকৃতি!" বললে রিকার্ডো।

"তাও আবার মানুষকে আক্রমণ করে, কোথায় লাগে সুপ্রসিদ্ধ ভয়ংকর টারানটিউলা," মন্তব্য রোমেরোর।

'ছুটতে ছুটতে কিছুটা বিপথে চলে এসেছে তারা। আবার গন্ধ অনুসরণ করে দিক পরিবর্তন করলে। এ দিকে হাতে পায়ে মুখে জায়গায় জায়গায় জ্বালা করছে, লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। পরে অনেক দিন লেগেছিল মাকড়সার বিষ ঝাড়াতে। যাইহোক, আর কিছুটা গিয়েই পৌঁছে গেল তারা গন্তব্য স্থানে, সেখানে আলো কিছুটা বেশি কারণ একই জাতের গাছগুলি খুব উঁচু নয়। কিন্তু ডালগুলি এখানে সেখানে মোচড়ানো, পাকানো, বাঁকানো—গাছটা যেন বিকলাঙ্গ কোনও প্রাণী। ডালে ডালে অনেকটা ধুতরোর আকারের সাদা সাদা ফুল, কিন্তু প্রায় এক হাত লম্বা। ফুলের উগ্র গন্ধ নেশা ধরিয়ে দিলে তাদের। গাছের পাতাগুলি ছয় ভাগে ভাগ হয়ে সরু লম্বা আঙুলের মত এগিয়ে আছে। আর ডাল থেকে ঝুলে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে বটের ঝুরির মত ঝুরি।

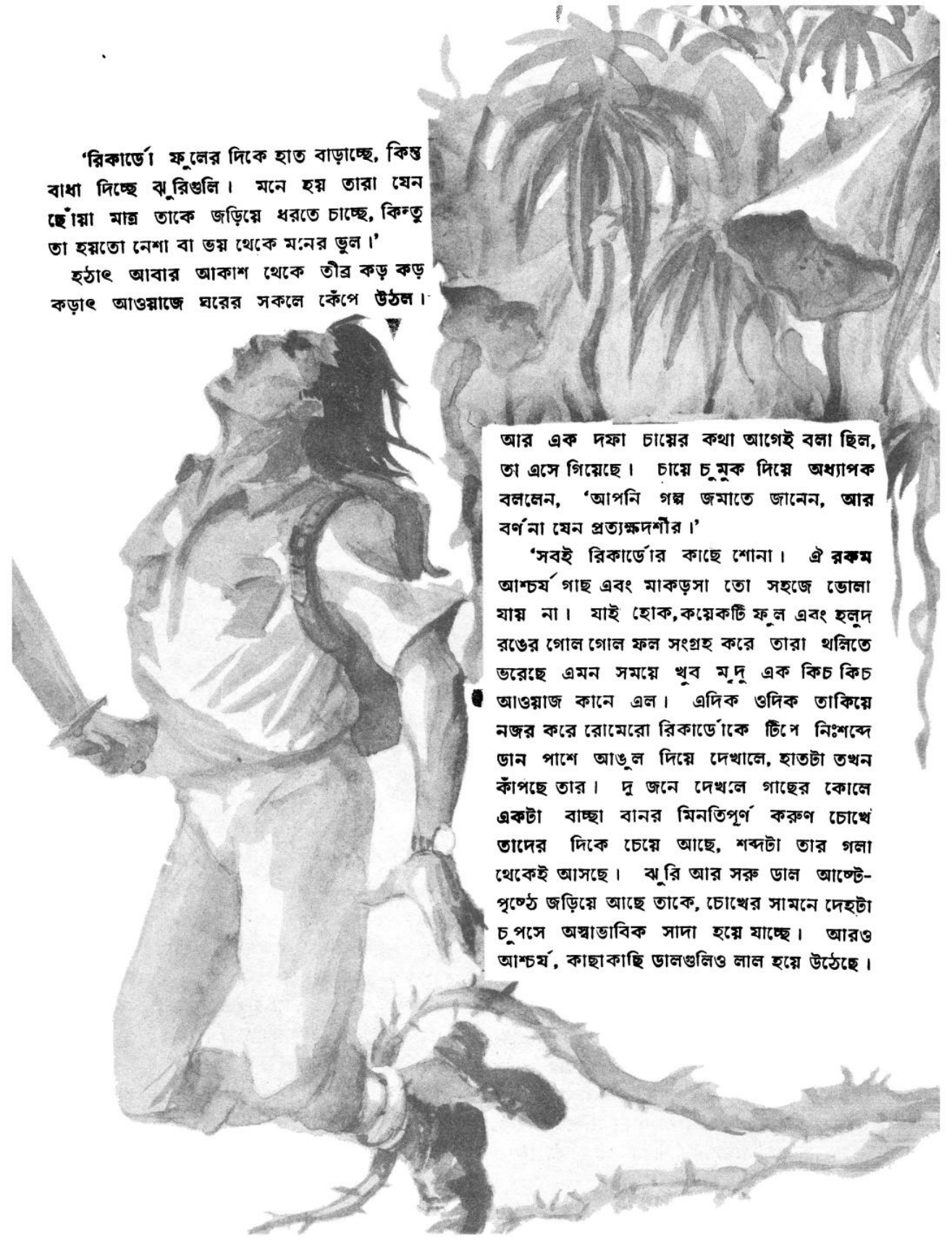

'রিকার্ডো ফুলের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, কিন্তু বাধা দিচ্ছে ঝুরিগুলি। মনে হয় তারা যেন ছোঁয়া মাত্র তাকে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু তা হয়তো নেশা বা ভয় থেকে মনের ভুল।'

হঠাৎ আবার আকাশ থেকে তীব্র কড় কড় কড়াৎ আওয়াজে ঘরের সকলে কেঁপে উঠল।

আর এক দফা চায়ের কথা আগেই বলা ছিল, তা এসে গিয়েছে। চায়ে চুমুক দিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'আপনি গল্প জমাতে জানেন, আর বর্ণনা যেন প্রত্যক্ষদর্শীর।'

'সবই রিকার্ডোর কাছে শোনা। ঐ রকম আশ্চর্য গাছ এবং মাকড়সা তো সহজে ভোলা যায় না। যাই হোক, কয়েকটি ফুল এবং হলুদ রঙের গোল গোল ফল সংগ্রহ করে তারা থলিতে ভরেছে এমন সময়ে খুব মৃদু এক কিচ কিচ আওয়াজ কানে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে নজর করে রোমেরো রিকার্ডোকে টিপে নিঃশব্দে ডান পাশে আঙুল দিয়ে দেখালে, হাতটা তখন কাঁপছে তার। দু জনে দেখলে গাছের কোলে একটা বাচ্ছা বানর মিনতিপূর্ণ করুণ চোখে তাদের দিকে চেয়ে আছে, শব্দটা তার গলা থেকেই আসছে। ঝুরি আর সরু ডাল আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তাকে, চোখের সামনে দেহটা চুপসে অস্বাভাবিক সাদা হয়ে যাচ্ছে। আরও আশ্চর্য, কাছাকাছি ডালগুলিও লাল হয়ে উঠেছে।

'স্তম্ভিত মানুষ দুটির পা যেন জমে গেল, এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখেও পালাতে পারছে না তারা। কিন্তু আরও এক ভীতিকর ঘটনায় হুঁশ ফিরে এল। হঠাৎ রোমেরোর চিৎকার, "রিকার্ডো, তোমার পায়ের দিকে চেয়ে দেখ—পালাও শিগগির।" শুনে রিকার্ডো এক লাফে পিছনে সরে এল। তাকিয়ে দেখলে গাছের গুঁড়ির থেকে লতার মত কি যেন একটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এই রকম আরও সরু ও মোটা লতা চার দিকে ছড়িয়েছে, কোনওটার গায়েই পাতা নেই, শুধু জায়গায় জায়গায় কাঁটা। রিকার্ডো সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার রোমেরোর আর্তনাদ, "আমার পা জড়িয়ে ধরেছে, বাঁচাও শিগগির।"

দেখা গেল বেশ মোটা একটা লতা তার বাঁ পায়ের কবজিতে শক্ত করে জড়িয়েছে। লাফালাফি করে বাঁধন ছাড়াতে পারছে না সে, বরং কাঁটাগুলি ত্বক ভেদ করে ক্রমেই গভীরে ঢুকছে বলে যন্ত্রণা আরও বাড়ছে। দেখতে দেখতে হতভম্ব রিকার্ডোর হুঁশ ফিরে এল, গায়ের জোরে তার কাটারি দিয়ে লতার গায়ে কোপ মারতে লাগল সে, যেখানে যেখানে কাটছে সেখানটা কেঁপে কেঁপে একটা রস বার হয়ে কালচে হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে মুক্ত হল পা, সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরে অনেকটা দূরে নিয়ে এল রিকার্ডো।

সেখানে ঐ গাছ আর নেই, মাটিতে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বিশ্রাম, তারপর একটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে রিকার্ডো পায়ে জড়ানো লতাটা খালাস করলে। ঐ টুকু সময়ের মধ্যে যেখানে যেখানে কাঁটা ফুটেছে তা ঘিরে গভীর ক্ষত হয়েছে। ভাল করে পা ফেলতে পারছে না রোমেরো, তবু বন্ধুর কাঁধে ভর করে ছুটল সেও। তারপর আর কি—শহরে ফিরে এসে অনেক দিন লাগল ঐ দগদগে ঘা সারতে। আর ঐ ফুল আর ফল উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা চিনতে পারেন নি।'

একে তো ঠাণ্ডা জায়গা শিলং, উপরন্তু বৃষ্টির জন্য কনকনে শীত পড়েছে। তার মধ্যে এই রোমাঞ্চক গল্প শুনে গায়ে শিহরণ হল শ্রোতাদের, মুড়িশুড়ি দিয়ে বসল তারা।

অধ্যাপক সোম বললেন, 'আমরা অবশ্য জানি গন্ধ আর রং দিয়ে উদ্ভিদরা কীট পতঙ্গদের আকর্ষণ করে, ফুল থেকে ফুলে নিজেদের দেহসংলগ্ন পরাগ ছড়িয়ে তারা উদ্ভিদের বংশ রক্ষা করে আর নিজেরা পায় খাদ্য। ঘটতরু ও অন্যান্য মাংসাশী গাছপালাও যে ঐ ভাবে শিকার আকর্ষণ করে সে কথা তো একটু আগেই হচ্ছিল। রিকার্ডো ও রোমেরোও গন্ধেই আকৃষ্ট হল, কিন্তু কোথায় মৌমাছি বা প্রজাপতি আর কোথায় মানুষ! আচ্ছা, ঐ গন্ধটা কি রকম বলতে পারেন? অর্থাৎ রিকার্ডো কি বলেছে তা?'

'হ্যাঁ, কোনও পরিচিত ফুলের গন্ধের মত নয়, বরং কিছুটা যেন কাঁঠালের এবং কিছুটা অ্যালকোহলের মত। বিজ্ঞানীরা সংগৃহীত ফুলে একটা অ্যালকালয়েড পেয়েছেন, তারই গন্ধ ওটা, কিন্তু ঐ বস্তু তাঁদের জানা আর কোনও ফুলে নেই।'

ডঃ বিশ্বাস বললেন, 'তা ছাড়া ঐ ঝুলন্ত ঝুরি এবং গুঁড়ির কাছাকাছি লতা যা বানর এবং মানুষ পর্যন্ত কাছে গেলে টের পাচ্ছে, জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে এমন বৈশিষ্ট্যের কথাও শুনিনি।' তাঁর মত আরওকজনের মনে সন্দেহ দেখা দিল এই কাহিনী কি সত্য, না বর্ষার দিনের আষাঢ়ে গল্প!

এক নিমেষে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সন্দেহের নিষ্পত্তি হয়ে গেল। হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল, দেখা গেল বক্তার পাজামার নিচে বাঁ পায়ের গোড়ালির উপর গোল হয়ে শুকনো ঘায়ের দাগ! সেই সঙ্গে শ্রোতারা তার চেহারাও দেখলে—দীর্ঘ দেহ, আধময়লা রং। বয়স মনে হয় ৪০ হবে। আর কপালে ও গালে সেই কাটা দাগ।

আগন্তুক চট করে পা নামিয়ে উঠে পড়লেন, 'আচ্ছা চলি—হ্যাঁ, ঐ চায়ের জন্য ধন্যবাদ।'

তিনি বেরিয়ে যেতে অনেকক্ষণ শুধু বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া কিছু শোনা গেল না। তার পর সুশান্ত বললে, 'রাম রহিম, রোমেরো শুনতে অনেকটা এক রকম।'

এই কাহিনীর আর এক আশ্চর্য পরিণতি আছে। পর দিন দুপুর থেকে রাম রহিম উধাও, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও যখন তিনি ফিরলেন না. দেখা গেল অধ্যাপকের মুখ বিশেষ গম্ভীর হয়ে উঠছে। শুধু বললেন, 'নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে—অবশ্য যা সন্দেহ করছি তা যদি সত্য হয়।' সন্দেহটা কি তা ভেবে আমাদের মনে রহস্য আরও ঘনীভূত হল মাত্র।

তৃতীয় দিন সকালেও যখন ১৩নং ঘরের বাসিন্দার দেখা পাওয়া গেল না, অধ্যাপক ছেলেদের বললেন, 'চল একটু বেড়িয়ে আসি।' সুন্দর সোনালি রোদ, হাঁটতে হাঁটতে আমরা বিভার রোডে পড়লাম, বাঁ দিকে পাহাড় উঠে গিয়েছে আর ডান দিকে গভীর খাদ জুড়ে ঘন জঙ্গল অনেক নিচ পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। উপরে এত আলো, কিন্তু খাদের তলায় প্রায় কিছুই দেখা যায় না, শুধু মনে হয় যেন একটা জলের রেখা চিক চিক করছে।

এক জায়গায় থেমে অধ্যাপক বললেন, 'একটা কিছু গন্ধ পাচ্ছ—উনি যেমন বলেছিলেন সেই রকম?'

খাদের দিকে মুখ করে সকলে টেনে নিঃশ্বাস নিলাম কয়েক বার, তার পর একে একে তিন চার জন বললে, 'হ্যাঁ সার, অনেকটা যেন কাঁঠাল আর অ্যালকোহলের মিশ্রিত গন্ধ, যদিও খুব মৃদু।'

'মৃদু, তার কারণ অনেক দূর থেকে আসছে।'

এক নিদারুণ আশঙ্কা আমাদের মনে মাথা তুলছে, সিধু কাঁপা গলায় বললে, 'কিন্তু আপনি নিজেকে অপরাধী ভাবছেন কেন সার?'

এক মুহূর্ত কি ভেবে অধ্যাপক বললেন, 'দিন কয়েক আগে ছিল পূর্ণিমা। আমাকে একজন বলেছিল খাদের ওপারে ঐ যে পাহাড়ের শ্রেণী তার উপরে পূর্ণ চন্দ্রোদয় অতি অপূর্ব দৃশ্য, তাই সে দিন সন্ধ্যায় একলা এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যিই সে দৃশ্য ভোলা যায় না, পাহাড়ের মাথায় ঐ যে সারি সারি গাছ কালো দেখাচ্ছে তাদের পিছনে প্রথমে অল্প অল্প জ্যোৎস্নার আলো ফুটল। তার পর উঁকি দিল লালচে থালার মত মস্ত চাঁদ। ধীরে ধীরে সে উঠে পড়ল পাহাড় ছাড়িয়ে। চারি দিক নিস্তব্ধ নির্জন, আদিম বন্য প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে একান্ত একা মনে হল, মনে হল কোটি কোটি বছর অতিক্রম করে আদিকালের পৃথিবীতে চলে এসেছি। মানুষ এখানে বেমানান অস্বাভাবিক।

'যাইহোক, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তখনই প্রথম গন্ধটা পাই, অপরিচিত ঠেকলেও তা নিয়ে কিছু ভাবিনি। কিন্তু রাম রহিমের কাছে গন্ধের বর্ণনা শুনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অবশ্য তখন কিছু বলিনি, ভুল করেছি পরদিন সকালে। এ দেশেও সম্ভবত ঐ আশ্চর্য গাছ আছে তা জানাতে ১৩ নম্বরে ঢুকলাম, খুব কৌতূহল নিয়ে শুনল সে, ঠিক কোথায় গন্ধটা পেয়েছি—অর্থাৎ যেখানে আমরা রয়েছি—তা ভাল করে বুঝে নিল। তখন কে জানত আমার নির্বুদ্ধিতার এই পরিণতি হবে!—'

কারও বুঝতে বাকি রইল না অধ্যাপকের সন্দেহ। সে দিনই দুপুরে লোকটি এখানে এসেছেন, ঘন গাছপালার বাধা পেরিয়ে ক্রমে ঐ গভীর জঙ্গলে নেমে গিয়েছেন, মুখোমুখি হয়েছেন ঐ মারাত্মক তরুর। কিন্তু কেন এই কষ্টকর দুঃসাহসিক অভিযান—বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, প্রতিহিংসা? কে জানে! নিশ্চয় এমনি কোনও বেপরোয়া উদ্যমের চিহ্ন মুখের ঐ কাটা দাগ। যাই হক, তার পরের ঘটনা কল্পনা করা কঠিন নয়—এ বার আর ছাড়া

পায় নি সে।

হোটেলের ম্যানেজার পুলিশে খবর দিল। তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করলে, কিন্তু কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। হোটেলের খাতায় লোকটির যে স্থায়ী ঠিকানা লেখা ছিল তদন্ত করে জানা গেল ঐ নামের কেউ সেখানে থাকে নি। তা অবশ্য আশ্চর্য নয়, কারণ এটা যে ছদ্মনাম তা আগেই সন্দেহ হয়েছিল। আরও জানা গেল যে সে দিন দুপুরে তিনি এক ধারালো ভারী কাটারি কিনেছিলেন। বিভার রোড ধরে খুঁজে খুঁজে এক জায়গায় গাছ কেটে পথ করবার চিহ্নও দেখা গেল। কিন্তু সেই পথ ধরে ধরে নিচে নামতে পুলিশ বা স্থানীয় লোক কেউ রাজী হল না। অবশ্য সাপ ও হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়ে—হিংস্র গাছের কথা কেউ শোনে নি, শুনলে বিশ্বাসও করবে না।

দু দিনের মধ্যে অধ্যাপকের বিষণ্ণতা কাটল না দেখে আমি বললাম। 'সার, আপনি হয়তো মিছিমিছি নিজেকে দোষ দিচ্ছেন। হয়তো ওটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছু না, পায়ের ঐ দাগ জন্মগত হতে পারে। নয়তো অন্য কারণে ঘা হয়েছিল, তার চিহ্ন। গল্প বলে উনি আমাদের বোকা বানাতে চেয়েছিলেন, তাই পাজামাটা একটু তুলে রেখেছিলেন। আলো আসার পর কার্য সিদ্ধ হল, তখন উঠে চলে গেলেন। ঘরে গিয়ে নিশ্চয় খুব হেসেছেন।'

সকলে অবাক হয়ে শুনল, বোধ হয় ভাবল আমি শুধু অধ্যাপকের মন ভাল করবার জন্য এ সব বানিয়ে বলছি। অবশেষে তিনিই বললেন, 'তা হলে মানুষটা উধাও হলেন, কেন? তাও সব জিনিস পত্র ফেলে!'

'ও সব নিতে পরে আসবেন—আমরা পরশু ফিরে যাচ্ছি, হয়তো তার পরে। ওঁর গল্পটা তো আমরা কাউকে বলিনি, সুতরাং তখন তা নিয়ে কোনও কথা উঠবে না। কিন্তু উধাও হলেন কেন? ঠিক আপনি যা ভাবছেন সেই সন্দেহ জাগাতে—অর্থাৎ উনি ঐ গাছের সন্ধানে গিয়ে মারা পড়েছেন, এতে ওঁর গল্পের আতঙ্ক আরও বাড়বে বলে।'

সিধু বললে, 'কিন্তু কাটারি কেনা, খাদের মুখে গাছ কেটে পথ করা—ও সব?'

আমি বললাম, 'ঐ নতুন লোককে ক জনে চেনে? ও সব হয়তো স্থানীয় লোকের কাজ। আমরা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হয়ে গাঁজাখুরি গাছ-পালায় বিশ্বাস করতে পারি না। কোথায় পোকাশিকারী আর কোথায় নরখাদক গাছ। তা ছাড়া উষ্ণ অ্যামাজনীয় জঙ্গলের গাছ এই ঠাণ্ডায়!'

কথাগুলি বললাম বটে. কিন্তু শুধু আমাদের বোকা বানাতে মানুষটা পালিয়ে গেলেন এতে মন ঠিক সায় দিতে চায় নি—এখনও দেয় না। তা ছাড়া, কিছু দিন পর পর অধ্যাপক দু বার হোটেলকে চিঠি দিয়েছিলেন, জানা গিয়েছে ১৩নং ঘরের বাসিন্দা ফিরে আসেন নি, তাঁর মালপত্র আছে পুলিশের কাছে।

লেখক পরিচয়

এই লেখার রচয়িতা প্রমদারঞ্জন রায় ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট। ১৯৪৯ সালে ৭৫ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়। প্রমদারঞ্জন আমার বাবা।

মাথায় প্রায় ৬ ফুট, দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারা। ফুটবল, হকি, ক্রিকেটের নাম করা খেলোয়াড়। চমৎকার ছবি আঁকার হাত আর অংকের মাথা। এগুলি হল গিয়ে বংশের ধারা। শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ বার্ষিক পরীক্ষাটি দেবার ঠিক আগেই ভারতীয় জরিপ বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং অফিসার গ্রেডে চাকরী পেয়ে, কর্ম জীবনের তিন ভাগ ভারতের আর বর্মার ও শ্যাম দেশের (এখন থাইল্যাণ্ড) ঘোর বনজঙ্গলের, দুর্গম পাহাড়ে ও উপত্যকার, দূরত্ব, উচ্চতা ও প্রকৃতি, নদী নালার দৈর্ঘ – গভীরতা ইত্যাদি মেপে, সেখানকার গাছপালা, ফসল, পশু সম্পদ নানা উপজাতীয় মানুষের ছবি, বর্ণনা ইত্যাদি স্বচক্ষে পরিদর্শন করে, ক্রমে আমাদের দেশের পক্ষে বিরল এক রকম পৌরুষের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন। প্রাণ হাতে করে বনে বনে ঘোরার এই কাহিনী, তাঁর নিজের হাতে লেখা ডাইরি থেকে অবিকল ভাবে তোলা।

কর্মজীবনের শেষ অংশ কলকাতার হেড অফিসে কেটেছিল। অবসর নেবার আগে ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অবসর নিয়ে নিজের ছোট ডাইরির নোট অবলম্বন করে যে পাকা কপি করে রেখেছিলেন, এই সন্দেশেই ধারাবাহিক ভাবে তার প্রথম প্রকাশ।

লীলা মজুমদার

যাঁরা জরীপের কাজ করে তাদের মধ্যে অনেককে ভারি ভয়ঙ্কর সব জায়গা ঘুরে বেড়াতে হয়। সেই সব জায়গায় হাতী, মোষ, বাঘ, ভাল্লুক আর গণ্ডার চলাফেরা করে। আবার যেখানে ঐসব হিংস্র জন্তু নেই, সেখানে তাদের থেকেও হিংস্র আর ভয়ানক মানুষ থাকে। প্রায় ২১/২২ বছর এইসব জায়গায় ঘুরে কত ভয় পেয়েছি, কত তামাসাই দেখেছি।

(১৮৮৯-৯৯) দেরাদুন—

কলেজ ছেড়ে চাকরীতে প্রবেশ করেই, প্রথমে কাজ শেখার জন্য দেরাদুনে যাই। সেই বছর দেরাদুনে আরও দুইজন হিন্দুস্থানী আর তিনজন বাঙালী অফিসার ছিলেন। তাঁরা সকলেই আমার থেকে সিনিয়র। তাঁরাও পাহাড় জঙ্গলের কাজ শিখতে গিয়েছিলেন। বাঙালী অফিসারদের মধ্যে একজন মিস্টার 'অ' আমার পূর্বপরিচিত, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমার তিন ক্লাস উপরে পড়তেন। অন্য দুইজনও (মিস্টার 'নি' আর মিস্টার 'হি') ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুরোন ছাত্র। মিঃ 'নি' আর মিঃ 'অ' আমাকে বড় স্নেহ করতেন। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দুইজনের মধ্যে সর্দার 'অ' শিখ (পাঞ্জাবী) আর মিঃ 'জ' অযোধ্যার লোক। সর্দার সাহেব ছিলেন ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কারও সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না, বেশী কথাবার্তা বলতেন না।

ক্যাম্পে আমরা ৪ জন বাঙালী একসঙ্গে মেস করেছিলাম। আমাদের তাঁবু ছিল দেরাদুন থেকে মাইল দুই দূরে, নালাপানিতে। শনিবার কাজ শেষ করে আমরা অনেকেই দেরাদুন আসতাম, আবার রবিবার সন্ধ্যার সময় তাঁবুতে ফিরে যেতাম, কেউবা রবিবার রাত্রিটা দেরাদুনেই কাটিয়ে, সোমবার ভোরবেলা ক্যাম্পে ফিরতেন। মিঃ 'হি' অনেক সময়ই রবিবার রাত্রে দেরাদুনে খাওয়া-দাওয়া করে গভীর রাত্রে তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হতেন, মিঃ 'নি' সর্বদা সন্ধ্যার আগেই তাঁবুতে ফিরতেন। আমাদের ক্যাম্পে ফিরবার রাস্তা ছিল একটা গোরস্থানের পাশ দিয়ে আর শ্মশানের মধ্য দিয়ে। দুই চার দিন মিঃ 'নি' একদিন তাঁকে তাড়া দিলেন, 'এত রাত্রে একলাটি এমন করে আস, তোমার ভয় করে না ? মিঃ 'হি' বললেন, 'কিসের ভয় ?'

'কেন, ভূতের ভয়। শ্মশানের উপর দিয়ে আসতে হয়, আবার তার পাশেই গোরস্থান !'

মিঃ 'হি' হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন, 'জ্যান্ত মানুষকেই কোনদিন ভয় করলাস না, এখন বাকী রয়েছে মরা মানুষকে ভয় !' মিঃ 'নি' ছিলেন একটু ভীরু স্বভাবের লোক। তিনি মিঃ 'হি'-র উত্তর শুনে চটে লাল হলেন।

নালাপানির কাজ শেষ হলে, আমরা আরও মাইল দুই দূরে সোং নদীর ধারে, রায়পুরে এক প্রকাণ্ড আম-বাগানে ক্যাম্প করে ছিলাম। এই আম বাগানের এক ধারে, ছয়জন সাহেবের তাঁবু একধারে আমরা পাঁচজন ভারতবাসী, আর এক-পাশে দুইজন ইনসট্রাকটর (Instructors) মুন্সি জ্যাকেরিয়া আর জাকিরুদ্দিন।

একদিন, রবিবার, সমস্ত সকালটা আমরা নিজের নিজের তাঁবুতে বসে, অফিসের কাজ করেছি। বেলা প্রায় বারোটার সময় খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, আমি মিঃ 'জ'-এর তাঁবুর দিকে যাচ্ছিলাম। পথে মুন্সি জ্যাকেরিয়ার তাঁবু দেখলাম, তার সামনে একটা টেবিলের উপর একটা খাপ-শুদ্ধ তলোয়ার আর সৈনিকের উর্দ্দি (Uniform, পাগড়ী, কোমরবন্ধ ইত্যাদি) রয়েছে। সেখানে মিঃ 'অ', মিঃ 'নি' আর মিঃ 'জ' দাঁড়িয়ে মুন্সিজীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, টেবিলের উপর এগুলো কি ?' মুন্সিজী বললেন, 'একজন সওয়ার (Sowar, Cavalry man) জরীপের কাজ শিখতে এসেছে, এ তার হাতিয়ার আর উর্দ্দি। আমি পাগড়ী, কোমরবন্ধ ইত্যাদি সব উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলাম। তারপর তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে, টেনে খাপ থেকে বার করলাম। তলো-য়ারের ব্যালেন্সটা পরীক্ষা করার জন্য হাতলটা ধরে জোরে, শূন্যে একটা খোঁচা মারলাম।

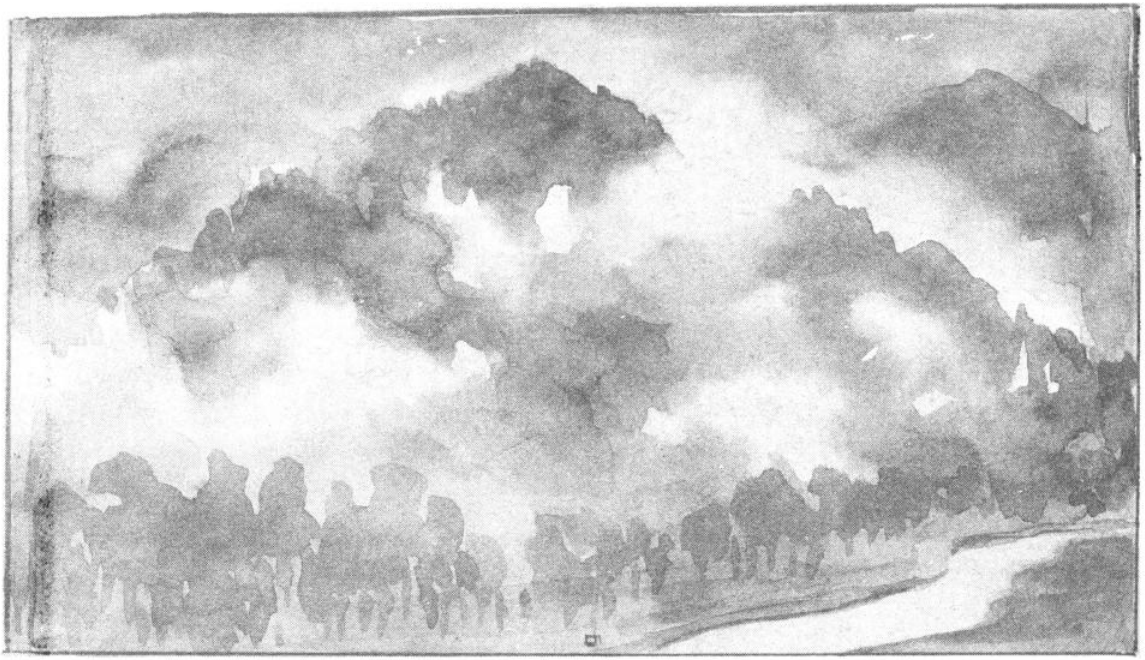

টেবিলের অন্য পাশে ৪।৫ ফুট দূরে ছিলেন মিঃ 'নি' তিনি 'বাপরে' বলে এক লাফে আরও ৪।৫ ফুট পিছনে সরে গেলেন। আর যায় কোথায়, তিনি যতই পিছনে হটে যান, আমিও ততই দুই পা এক পা করে এগিয়ে যাই, আর শূন্যে তলোয়ার চালাই, তিনিও আবার চীৎকার করে হটে যান। একবার চেয়েও দেখেন না যে, তলোয়ারের ডগা তাঁর ৪।৫ ফুটের মধ্যেও পৌঁছায় না। এই ব্যাপার দেখে, সকলে যত হাসে তিনিও ততই চীৎকার করেন, আর আমাকে গালি দেন, 'হতভাগা! রাখ্ ওটা হাত থেকে শীগগীর রাখ্।' তখন আমি তলোয়ার খানা খাপে পুরে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। মুন্সিজী হাসতে হাসতে সেটা তাঁবুর ভিতর রেখে এসে মিঃ 'মি' কে বললেন, 'গেস্ সা মৎ করো বাবু সাহাব! উহ্ তো ইস্কুলকা ছোকরা হৈ।'

সোং নদীর অপর পারে দোয়ারা পাহাড়ে আমরা চারজন (মিঃ 'নি, মিঃ 'অ', মিঃ 'জ' এবং আমি) এক সঙ্গে কাজ করতে গিয়েছিলাম। কাজ করতে করতে যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুলাম, তখন ঝড় আর মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। সকলে মিলে একটা বড় ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে, বড় বড় জরীপের ছাতার আড়ালে অতি কষ্টে ম্যাপগুলিকে রক্ষা করলাম। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে ঝড়বৃষ্টি থামল। আমরাও বাকি কাজটুকু শেষ করতে ব্যস্ত হলাম। অল্প একটু মাত্র বাকি আছে, এমন সময় মিঃ 'নি' বললেন, 'এক্ষুনি চল, না হলে তাঁবুতে পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। আমরা বললাম, 'সামান্য একটুকু কাজের জন্য আবার কাল এতদূর আসা হতে পারে না। একটু সবুর করুন, এইটুকু শেষ। করেই যাব' কিন্তু মিঃ 'নি' কিছুতেই রাজি হলেন না, বললেব, 'একে ত বিশ্রী রাস্তা, তার উপর আবার বৃষ্টি হয়ে পিছল হয়েছে, অন্ধকার হয়ে গেলে এ পথে যেতেই পারব না, এক্ষুনি চল।' তখন আমরা বললাম, 'তাহলে আপনি এগোন্, আমরা কাজটুকু শেষ করে যাচ্ছি, আপনাকে পথে ধরে নেব।'

মিঃ 'নি' চলে গেলেন। যাবার সময় আমার বল্লমটা (Khud Stick) সঙ্গে নিলেন তাঁর নিজেরটাও নিলেন। আমরা ২০।২৫ মিনিটে বাকি কাজটুকু শেষ করলাম। ততক্ষণে পশ্চিম দিক লাল করে সূর্য্য অস্ত যায় যায়। মিঃ 'অ' বললেন, 'চল, যে দিক দিয়ে এসেছি, সেই দিক দিয়ে ফিরে যাই।'

আমরা বললাম, 'না, ও পথে বড় খাড়া। চড়বার সময়ই ৩/৪ বার ধরে ধরে উঠতে হয়েছিল, এখন বৃষ্টিতে ভিজে ওসব জায়গা আরও বিশ্রী হয়েছে। অনর্থক ঝুঁকি (Risk)

নেবার দরকার নেই।'

মিঃ 'অ' গ্রাহ্যই করলেন না, একজন পাহাড়ী খালাসী সঙ্গে নিয়ে ঐ দিক্ দিয়েই চলে গেলেন। আমি আর মিঃ 'জ', রাস্তা ধরে চললাম। রাস্তা প্রায় ২৷৷০ ফুট চওড়া, দেওয়ালের মত প্রায় খাড়া পাহাড়ের গায় এঁকে বেঁকে নেমেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে, আমি আর মিঃ 'জ' দৌড়ে চললাম, খালাসীরাও আমাদের পিছনে পিছনে দৌড়ে নামতে লাগল। (প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা নেমেছি, এমন সময় মিঃ 'জ' বললেন, প্রায় 'সামনে যেন মিঃ 'নি'-কে দেখতে পাচ্ছি।' আমি বললাম, সে কি রকম ? তিনি আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছেন। এতক্ষণে নীচে নালায় পেঁছে যাবার কথা।'

মিঃ 'জ' বললেন, 'ঐ দেখ।' চেয়ে দেখলাম সত্যি সত্যিই মিঃ 'নি' নামছেন। সে নামা এক অদ্ভুত কাণ্ড! তিনি ত খাদের দিকে পিছন ফিরে, গাহাড়ের দেওয়াল ঘেঁষে, দুই হাতে দুটো বল্লমে ভর দিয়ে এক এক পা ফেলছেন আর দুইজন পাহাড়ী খালাসী তাঁর দুই পাশে হাত দিয়ে তাঁকে আগলিয়ে রয়েছে। ঠিক যেন ক্ষুদে শিশু তার মা বাবার হাত ধরে ধীরে ধীরে পা ফেলছে, পাশের দিকে, যেমন করে করে ডাঙায় কাঁকড়া চলে।

আমরা দুইজন দৌড়ে নামছিলাম। আমাদের পায়ে ছিল মোটা বুট তাতে দুম্ দুম্ শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দ কানে যাওয়া মাত্র, মিঃ 'নি' একেবারে বসে পড়লেন। আমারও ভূত চাপল। রাস্তার পাশে বড় বড় পাথর ছিল, তার একটাকে ঠেলে ফেলে দিলাম। হড়্ হড়্ শব্দে, সমস্ত ভেঙে চুরমার করে, সেটা যেন একেবারে পাতালে চলে গেল। বেচারি 'নি' তাঁর কি যে দুরবস্থা হল! চোখ বুজে বসে শুধু আমাকে বকতে লাগলেন, হতভাগা! তোর না হয় তিনকূলে কেউ নেই, মরতে হয় তুই খাদে পড়ে মরনা! আমাদের কেন আবার টানছিস ?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি বললাম, 'আচ্ছা দাদা, আর না। আপনি চলুন, আমরা আপনার পিছন পিছন আস্তে আস্তে নামছি।'

মিঃ 'নি' বললেন, 'না, কিছুতেই না। তোকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। তাই তুই এগিয়ে না গেলে আমি উঠছি না এখান থেকে।'

কি আর করা যায়! আমি আর মিঃ 'জ' অতিকষ্টে পাশ কাটিয়ে তাঁকে পার হয়ে গেলাম। তিনি চোখ বুজে, পাথরের গা ঘেঁষে বসে রইলেন। আমরা দৌড়ে নেমে গেলাম, নীচে সোং নদীতে পেঁছে দেখি, মিঃ 'অ' আমাদের অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। দেখেই বললেন, 'এত দেরি কেন ?' তখন সব কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, সবুর কর, তিনি আসুন।' অনেকক্ষণ পরে মিঃ 'নি' এলেন। এসেই আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে বললেন, 'হতভাগা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য (Reckless fool)।

আগেই বলেছি সর্দ্দার 'অ' ধীর গম্ভীর লোক, কারও সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। তিনি কাজ করতে যেতেন একা। আমরা তিন চারজন একসঙ্গে যেতাম। আমরা কাজ করে তাঁবুতে ফিরে এলে সর্দ্দার 'অ' রোজ রাতে মিঃ 'জ'-এর নক্সাখানা নিয়ে তাঁর নিজের নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন, কোন্ দিকে কতটুকু কাজ আমরা করেছি, কোন পাহাড়ে কতটুকু উঁচু পর্যন্ত চড়েছি, ইত্যাদি। যদি দেখতেন যে, কোন দিকে তাঁর থেকে বেশী দূর আমরা মেপেছি কিংবা কোন পাহাড়ের বেশী উঁচু পর্যন্ত আমরা উঠেছি, অমনি তার পরদিন ঐ পাহাড়ে গিয়ে, আমাদের থেকে একটু বেশী কাজ করে আসতেন। এই দেখে একদিন আমার ঘাড়ে ভূত চাপল, সর্দ্দার সাহেবকে একটু ভুলিয়ে জব্দ করতে হবে।

আমরা সত্যি সত্যিই যতটুকু জরীপ করে ছিলাম তার বাইরে ছিল টিম্‌লী পাহাড়। আমি আমার আর মিঃ 'জ'-এর নক্সার উপর ঐ আঁকাটার চারদিকে পেনসিল দিয়ে আরও ৫।৭ খানা আর পাহাড়, কতকটা আন্দাসে আর কিছুটা কল্পনার সাহায্যে, এঁকে একটা নক্সা তৈরী

করলাম, যেন আমরা ঐসব জরীপ করে এসেছি! সর্দ্দার সাহেব রোজ মিঃ 'জ'-এর নক্সাই দেখে থাকেন, আমারটা কখনো দেখেন না, সেইজন্যই মিঃ 'জ'-এর নক্সার উপর এঁকেছিলাম। আমার কাণ্ড দেখে মিঃ 'জ' বললেন, 'তুমি দেখছি এই গরীবকে কাল টিমলী পাহাড়ে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। আমি বললাম, তা ঠিকই বলেছেন। উনি যেমন লোক, তাঁর একটু সাজা হওয়া দরকার! সে রাত্রেও সর্দ্দার সাহেব মিঃ 'জ'-এর নক্সার সঙ্গে নিজের নক্সা মিলিয়ে দেখলেন।

পরদিন সকালে কাজে বেরোবার সময় মিঃ 'জ' সর্দ্দার সাহেবকে ডাকলেন, তাঁর চাকর এসে বলল, 'উহ্ তো রাত ৪॥০ বাজে কাম পর চলে গয়ে!'

আমরা কাজকর্ম শেষ করে, সন্ধ্যার পর তাঁবুতে ফিরলাম। সর্দ্দার সাহেব তখনও ফিরে আসেন নি। একটু দুঃখ হল, তাড়াতাড়ি লণ্ঠন দিয়ে ৩।৪ জন লোক পাঠালাম। তাঁর সন্ধান করার জন্য। তিনি অনেক রাত্রে ফিরে এলেন।

ভোরে উঠেই সর্দ্দার সাহেব মিঃ 'জ'-এর নক্সার জন্য লোক পাঠালেন, তাঁর নিজের নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। মিঃ 'জ'-এর নক্সা দেখেইত তাঁর চক্ষুস্থির! মিঃ 'জ'-এর নক্সাতে টিম্‌লী পাহাড়ের আশেপাশে কোন কাজ নেই, পরিস্কার সাদা কাগজ মাত্র!! বলা বাহুল্য, আগের দিনই আমি রবার দিয়ে ঘষে সব পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। সর্দ্দার সাহেব তখনই মিঃ 'জ' কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল আপনার নক্সায় ঐ কাজটুকু দেখেছিলাম, আজ কেন দেখতে পাচ্ছি না?' মিঃ 'জ' বললেন, 'ওখানে ত আমরা কাজ করিনি, ওটুকু ছিল প্র-এর কল্পনায় আঁকা। কাল কাজে যাবার সময় ও নিজেই সে সব মুছে ফেলেছে।' মুখখানা গম্ভীর করে সর্দ্দার সাহেব্ নাকি শুধু বলেছিলেন, রাস্‌কেল, শয়তান্।

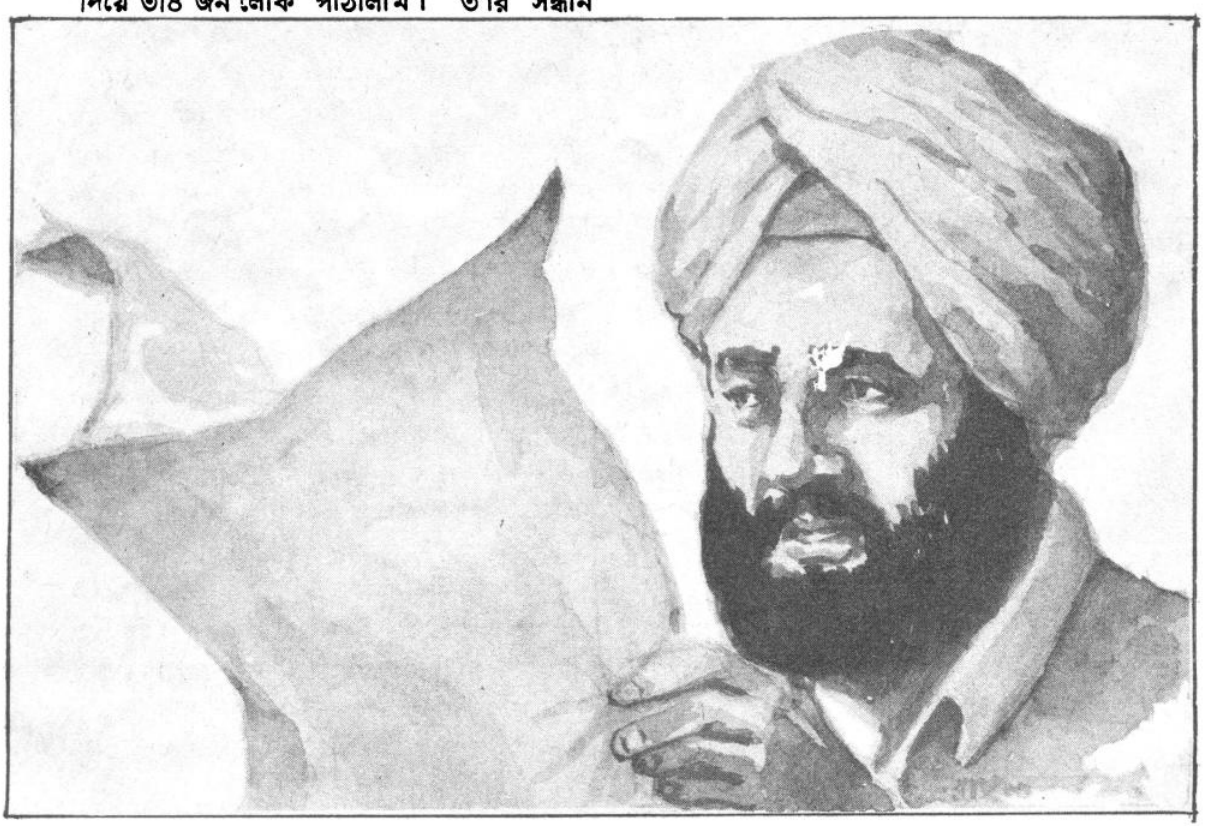

দেরাদুনে থাকতেই আমার উপর হুকুম হল, ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে। একটা ঘোড়ার বন্দোবস্ত করলাম। পূর্বে কখনও ঘোড়ায় চড়িনি কাজেই শিক্ষাটা তত সহজ হল না। জিনের সঙ্গে যেন আড়ি, একটু নড়াচড়াতেই সেটা আমাকে ঠেলে ফেলে দিবার উপক্রম করতে লাগল।

সে সময়ে দেরাদুনে সরকারী বন বিভাগের ডেপুটি কনসারভেটর রায় বাহাদুর ক, থাকতেন একদিন তিনি আমার ঘোড়ায় চড়ার অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবাজীর বুঝি এই প্রথম চেষ্টা?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'আচ্ছা চল, আমি তোমাকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিচ্ছি।' বলা বাহুল্য, তাঁর শিক্ষার গুণে অল্পদিনের মধ্যে আমার ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস হয়ে গেল।

রায় বাহাদুর ছিলেন পাকা শিকারী, বাঘ ভালুক তিনি অনেক শিকার করেছেন। তাঁর অনেক গল্প শুনেছিলাম। তার মধ্যে একটি গল্প বড়ই হাস্যকর। তখন তিনি চক্রাতার ডেপুটি কনসারভেটর; তাঁর এক ভাইপো ছিলেন। অবসর মত খুড়োর বন্দুক দিয়ে কখনও কখনও পাখী শিকার করতেন।

রায় বাহাদুরের শিকারের বড় সখ, তাই তাঁর অধীনে বনের প্রহরীদের (Forest guards) উপর হুকুম দিয়েছিলেন বাঘের সন্ধান পেলেই তাকে খবর দিতে। একদিন কার্যোপলক্ষ্যে তাঁকে দেরাদুন চলে আসতে হয়েছিল। তার পরের দিনই সকালে দুইজন বনের প্রহরী এসে উপস্থিত! জিজ্ঞেস করল, 'সাহেব কোথায়?' ভাইপো বললেন, 'কেন? সাহেব কাল দেরাদুন গিয়েছেন।' প্রহরী বলল, 'তাঁকে শীগগির খবর পাঠাও, মস্ত বড় বাঘ।'

'কোথায় বাঘ?'

'এই মাইল দুই দূরে প্রকাণ্ড মোষ মেরেছে।'

রায় বাহাদুরের ভাইপো বললেন, 'সাহেব ত তিনচার দিন পর আসবেন, তোমরা গিয়ে মাচা বাঁধ, আমি বাঘ মারব।'

প্রহরী বলল 'বাবু, তুমি পারবে না। মস্ত বড় বাঘ, একটা মোষ মেরে অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছে।'

'তুমি পারবে না' শুনে বাবুর ভারী রাগ হল। 'সাহেবের রাইফল বন্দুক মজুত রয়েছে, পারব না আবার কি?' ধমক খেয়ে প্রহরীরা একটু ভয় পেল। হাজার হোক সাহেবেরই ত ভাইপো। তারা একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা বাবু, তিনটার সময়ে তুমি তৈরি হয়ে থেকো, আমরা আসব।'

অমনি মাহুতের উপর হুকুম হল 'তিনটার সময়ে যেন হাতী প্রস্তুত থাকে বাঘ মারতে যাব।'

যথা সময়ে হাতিয়ার নিয়ে তাঁরা বের হলেন। পথে বৃদ্ধ সর্দার প্রহরী ভাইপোকে শিখিয়ে রাখল, বাঘ আসা মাত্রই যেন বন্দুক ছোঁড়া না হয়। বন্দুক বাগিয়ে বসে থাকতে হবে। সর্দার প্রহরী বাবুর গা টিপলে যেন ফায়ার করা হয়। বাবু বললেন, 'আচ্ছা' বাঘের জায়গায় পৌঁছিয়েইত বাবু চটে লাল। 'মাচা এত নীচু করে কেন বাঁধা হয়েছে?' প্রহরী বলল, 'বাবু সাহেবের জন্য আরো ঢের নীচু করে মাচা বাঁধা হয়, তুমি নতুন লোক বলে উঁচু করে বেঁধেছি। মাচা বেশী উঁচু হলে মারবার সুবিধা হয়না।'

শিকারীর দল মাচায় উঠে বসলে, ভাইপো মাহুতকে হুকুম দিলেন—'পর পর দুইবার বন্দুকের আওয়াজ করলেই হাতী নিয়ে আসবে।'

রাইফেল হাতে ভাইপো মাচার মাঝখানে বসলেন, দুইজন প্রহরী তাঁর দুই পাশে। সর্দার প্রহরী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল যেন তাক করে প্রস্তুত হয়ে থাকেন আর সে আঙ্গুল দিয়ে তাঁর গা টিপলে পর যেন বন্দুক ছোঁড়া হয়। সব ঠিক এবার বাঘ এলেই হয়।

সন্ধ্যার আগেই কিছু দূরে একটা শব্দ হল 'হিঁয়া ও' যেন একটা কুকুরে মোটা গলায় হাই তুলল। প্রহরীরা ফিসফিস করে বলল 'ঐ এসেছে।' আবার ক্ষণকাল সব নিস্তব্ধ। দশ

পনের মিনিট পর, খানিক দূরে ক্যাঁও ক্যাঁও শব্দ করে একটা ময়ূর উড়ল। প্রহরীরা ভাইপোকে ইসারায় সাবধান করে বলল, 'ঐ এসেছে!' কয়েক মিনিট পরে সত্যই এসে উপস্থিত হল, প্রকাণ্ড এক বাঘ যেন লাল রংয়ের ঘোড়া। মহিষটাকে প্রহরীরা টেনে পাঁচ সাত ফুট সরিয়ে রেখেছিল। বাঘ সেটা লক্ষ্য করে সোজা মহিষটার কাছে না গিয়ে একটু দূরে বসে রইল আর চারদিক দেখতে লাগল। কয়েক মিনিট দেখে, সটান গিয়ে মহিষটার উপর হামা দিয়ে বসল, পিছনের দুই পা মাটিতে আর সামনের দুই পা মহিষের উপর। তখন আবার চারদিক দেখে নিয়ে, খেতে আরম্ভ করল। সর্দার প্রহরী শিকারীর গায়ে চাপ দিল। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করেও বন্দুকের আওয়াজ হল না দেখে আবার আস্তে আস্তে আঙ্গুলের চাপ দিল। কিন্তু তবুও কোনো ফল হল না, ভাইপো বন্দুক ছুঁড়লেন না। তখন সর্দার প্রহরী চেয়ে দেখল, ব্যাপার কি? ব্যাপার গুরুতর, ভাইপোর চোখ কপালে উঠে গেছে, দাঁতকপাটি লেগে গেছে, হাত পা আড়ষ্ট!

সর্দ্দার গার্ড বুঝতে পারল, এই বাঘ শিকার করা তাঁর কর্ম নয়। আবার ভাবল, এমন সুযোগ চলে যাবে? তবে আমিই মারি। এই ভেবে সে ধীরে ধীরে ভাইপোর হাত থেকে বন্দুকটি তুলে নিতে গেল। আর যায় কোথায়! গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে, (ঘুমের মধ্যে মুখ চেপে ধরলে লোকের যেমন অবস্থা হয়)। ভাইপো তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। এই গোলমালে কি আর বাঘ সেখানে থাকতে পারে? উপরের দিকে চেয়ে শিকারীদের দেখতে পেয়েই ভীষণ গর্জন করে এক লাফ দিল এবং সেই মুহূর্তে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন প্রহরীরা বলল, 'বাবু, আর কেন? এবার দুবার বন্দুকের আওয়াজ কর, হাতী আসুক, ফিরে যাই। আজ আর বাঘ আসবে না।' বাবুর মুখ দিয়ে কথা বার হল না, খালি ঐ মুখ চাপা গোঁ গোঁ শব্দ! বন্দুকটি আঁকড়িয়ে ধরে রইলেন, ভয়ে পাছে প্রহরীরা বন্দুক ছোঁড়ে আর শব্দ শুনে বাঘ এসে আক্রমণ করে। বন্দুক ছোঁড়া হল না, হাতীও আর এল না, সমস্ত রাতটা ঐ মাচায় বসে কাটাতে হল।

এদিকে রায়বাহাদুরের বাংলোতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ব্যাপার কি? ভোর হতে চলেছে তবু বন্দুকের আওয়াজ হল না কেন? এই রকম ভেবেচিন্তে নিজেরাই হাতীতে চড়ে সন্ধান করতে গেল। হাতী যখন গাছতলায় পৌঁছল তখনও ভাইপো নামতে চাইলেন না, কে জানে হয় তো হতভাগা বাঘ কোনো ঝোপের মধ্যে বসে রয়েছে! তখন সকলে ধরাধরি করে তাঁকে মাচা থেকে একেবারে হাতীর পিঠে নামিয়ে নিল।

বাংলোতে পৌঁছে ভাইপোর যা দুরবস্থা দেখা গেল, সেটা আর বলা যায় না! দুর্গন্ধে তাঁর কাছে যাওয়া মুস্কিল, কাপড়ের মধ্যে প্রায় সের দেড়েক বোঝা! বাঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস কাণ্ডটি হয়ে গেছে!!!

রায় বাহাদুরের এই গল্পটি শুনে মনে তাঁর ভাইপোটি কি ভীরু! কিন্তু পরে অনেকবার বাঘের মুখে গর্জন শুনে মনে হয়েছে যে ভাইপোর মত ওরকম হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

(১৮৯৯-১৯০০-ব্রহ্মদেশ, শান ষ্টেট)

দেরাদুনে প্রায় এক বৎসর ছিলাম। তারপর আমার উপর ব্রহ্মদেশে শান স্টেটে যাবার হুকুম হল।

দেরাদুন থেকে রেলে কলকাতা, জাহাজে রেঙ্গুন। রেঙ্গুন থেকে আজি জংশন (বিফটিন্দ রোড) তারপর হাঁটা পথে শানস্টেট। আজি থেকে টাউংজী (দক্ষিণ শান স্টেটের প্রধান সহর) ১১০ মাইল, দশ দিনের পথ। টাউংজী থেকে আমাদের কর্মস্থান আরো বারো তেরো দিনের পথ। প্রথম বারে সমস্ত পথটাই হেঁটে গিয়েছিলাম। যে কয়দিন বড় রাস্তা ধরে চলেছি সে কয়দিন তাঁবু খাটাতে হয়নি। দশ বারো মাইল পর পর সরকারী আড্ডা আছে, সেই আড্ডায় বাংলোতে রাত্রি কাটিয়েছি। বড় রাস্তা ছেড়ে তাঁবুর আশ্রয় নিতে হয়েছে। সে সময়ে শান স্টেটে রেল লাইন খোলা হয়নি, টাউংজী পর্য্যন্ত গরুর গাড়ী চলত। তারপর খচ্চর বা বলদ সম্বল ছিল। আমার কাজে সাহায্য করবার জন্য রামশরদ নামে একজন বৃদ্ধ সার্ভেয়ার আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। সার্ভেয়ারটি ছিল ব্রাহ্মণ, বাড়ী অযোধ্যায়। প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর সরকারী জরীপ বিভাগে কাজ করেছে। আর দুটি চাকর, তারই দেশের লোক, সুচিৎ আর বেণী। (এদের কথা আগেও বলা হয়েছে) খুঁটিনাটি নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। বেচারা বুড়োর আর সহ্য হয় না। সেইজন্য বিরক্ত হয়ে একদিন বেণীকে বলল, 'তোমরা দুইজনে সরকারের চাকর। কাজ কর সরকার বাহাদুরের, খেতে দিই আমি, তাই নিয়ে ওর সঙ্গে ঝগড়া কেন? তোমার ত আর সে খায় না। ইত্যাদি' বেণী চটে গিয়ে আর বুড়োর ভাত খায় না। নিজে আলাদা রেঁধে খায়। বুড়োর কোনো কাজও আর সে করে না, দিব্য আরামে বসে থাকে। আগের ব্যবস্থা ছিল যে পালা করে তারা দুজনে বাবুর কাজ করে দিবে এবং দরকার মত বাবুর সঙ্গে জঙ্গলে কাজ করতে যাবে। আগে সুচিৎই বাবুর সঙ্গে কাজে যেত, বেণী কখনও যেত না, সে শুধু রান্না করত। বেণী ঝগড়া করে এখন বেশ বসে বসে দিন কাটায়, জঙ্গলেও যায় না, বাবুর কাজও করে না। সুচিৎকে দুই কাজই করতে হয়।

আমি দুই তিনদিন পর বেণীকে একটু চাপ দিলাম, 'বেণী তুমি বাবুর কাজ না কর, বেশ। কিন্তু সরকারের মাইনে যখন খাও তখন তোমাকে সরকারের কাজ করতেই হবে। বসে থাকতে পাবে না। কাল থেকে তুমি বাবুর সঙ্গে কাজে যাবে, কাজে না গেলে তোমার মাইনে কাটা যাবে। সুচিৎ যখন বাবুর রান্নাবান্না সব করে দেয়, তখন সে আর কাজে যাবে না।

বেণীর জঙ্গলে গিয়ে অভ্যেস নেই, সে মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। কিন্তু উপায় নাই, তাই তাকে যেতেই হল। কাজে বেরোচ্ছি, দেখি বেণীর পিঠে একটা বড় বোঁচকা বাঁধা। 'ওটা কিরে?' বুড়ো হেসে বলল, 'আরে বাবুজী উসমে উসকা জনম ভরকে কামাই! 'ব্যাপার কি?' তখন শুনলাম, বেণীর যা কিছু পুঁজি আছে, সব বোঁচকার মধ্যে, ৩৬৭ টাকা! বেণী ভীষণ কৃপণ, কাউকেই বিশ্বাস করে না। সেইজন্য এই টাকা দেশে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে রেখে আসে না। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরে। তাঁবুতেও রেখে যাবে না, যদি কেউ চুরি করে!

তিনচার দিন বোঁচকা বেঁধেই বেণী কাজে গেল। তারপর একটা লম্বা থলে সেলাই করে, তাতে টাকাগুলি ভরে, সেটা কোমরে জড়াল। তার উপর আবার একটা কম্বল যখন জড়াল তখন সে যে কি ভীষণ ভুঁড়ি হল, তা আর কি বলব! কিন্তু এমন করে কদিন আর চলবে?

একে ত জঙ্গলের কাজ করে তার অভ্যাস নাই, তার উপর আবার বাবুরটা খায় না, তাই চর্ব্য-চোষ্যও আর জোটে না। একবেলা শুধু দুটি শুকনো ভাত খায়। কাজেই বেণী একটু কাবু হয়ে পড়ল।

সেদিন আমরা সেলউইন নদী পার হয়ে নদীর কিনারায় তাঁবু খাটিয়েছি শানেরা নদীতে মাছ ধরছিল,আমাদের কাছে মাছ বিক্রি করতে আসল। বুড়ো অযোধ্যার ব্রাহ্মণ হলেও মাছ-মাংসের বেশ ভক্ত। আমি মাছ খাইনা, বুড়োকে দেখিয়ে দিলাম, বুড়োও বলল মাছ কিনবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম,'কেন, কিনবেনা?' বুড়ো বলল 'সুচিৎ ভাল রাঁধতে পারে না, মিছিমিছি মাছ নষ্ট করব কেন?' আমি বললাম,'মাছ রাখ আমার চাকর সুচিৎকে মাছ রান্না দেখিয়ে দেবে।' বুড়ো একটু ইতস্ততঃ করে একটি মাছ কিনল।

আমি একটু ঘুমিয়ে উঠেছি, স্নান করব। মাছ রান্নার গন্ধ পেয়ে দেখতে গেলাম আমার চাকর সুচিৎকে মাছ রান্না দেখিয়ে দিচ্ছে কি না। গিয়ে দেখি বেণীই বুড়োর জন্য রান্না করছে।

জিজ্ঞাসা করলাম,'কি বেণী! একি হল?'

বেণী বলল, 'আরে হুজুর! বাবু না হয় রাগ করে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি ত কদিন থেকে দেখছি যে বাবুর খাওয়া হয় না। সুচিৎ ত রাঁধতে জানে না, তাই মাছটা রেঁধে দিচ্ছি।'

বুড়ো আমাদের কথাবার্ত্তা শুনে তাঁবুর বাইরে এসে হাসছিল। তারপর সন্ধ্যার সময় দেখি, বেণী বুড়ো আর সুচিৎ-এর সঙ্গে বসে মাছ ভাত খাচ্ছে, হতভাগা মাছের লোভটা আর ছাড়তে পারেনি!

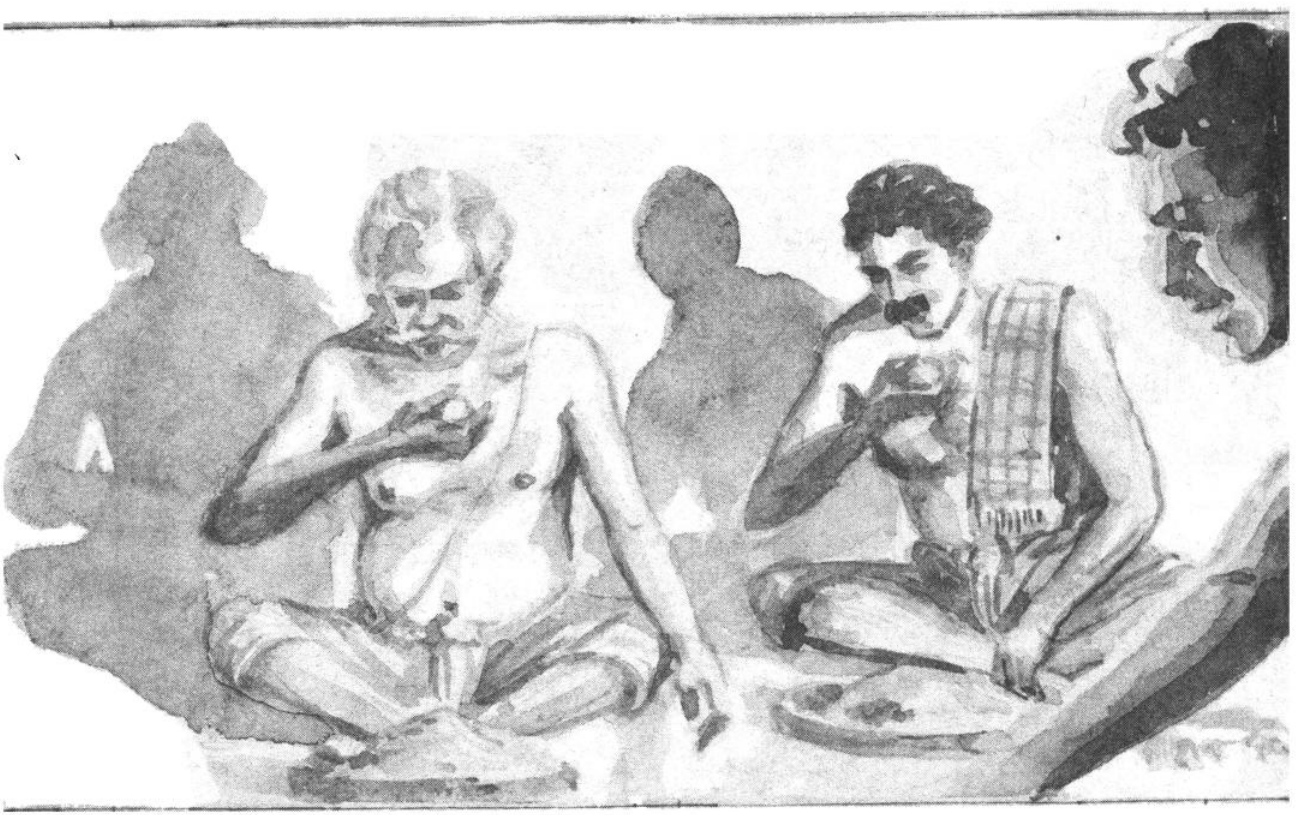

সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শাস্তি

অনেকদিন আগেকার কথা, মালব দেশে এক অদ্ভুত চোর বাস করত। সে শুধু বছরে একবারই চুরি করত, তার কারণ হল তিন কুলে তার কেউ ছিল না, না বউ ছেলে-পুলে, না কোনো আত্মীয়স্বজন, বেশি রোজগার করবার তার কোন দরকারই ছিলনা।

একবার সে চুরি করতে বেরিয়েছে। রাস্তায় একটা ছোট নদী পড়ে। ওপার থেকে এক সওদাগর আসছিল। ঘুরে ঘুরে সওদাগর এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত নদীর ধারে বসে আগে একটু জিরিয়ে নিল, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে সবে দু এক আঁজলা জল খেয়েছে, এমন সময় সেই চোর এসে হাজির হল। সওদাগর চোরকে ভাল করেই চিনত। তাই ওকে দেখেই ত ভয়ে ওর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। জল খাওয়া চুলোয় গেল, ভাবল চোর বোধ হয় ওর যথাসর্বস্ব এবার কেড়ে নেবে।

চোর কিন্তু ওকে অভয় দিয়ে বলল—সওদাগর দাদা! কিছু ভয় নেই, তুমি আরাম করে জল খাও, তোমার কিছু আমি চুরি করব না, শুধু তোমার এই ছড়িটা আমাকে দান করে যাও। সওদাগরের আর জল খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, পালাতে পারলে বাঁচে, এখন আবার ছড়ির কথা শুনে মুখ শুকিয়ে গেল, বলল—ভাই এই ছড়িটি তুমি চেও না, আর যা চাও তাই দেব, এটি আমার বড় প্রিয় ছড়ি,

অনেকদিনের ব্যবহারে এটার ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে—। চোর কিন্তু কোন কথাবার্তা না বলে হঠাৎ ছড়িটা টেনে নিয়ে ভেঙেগ দু টুকরো করে ফেলল, আর যেমনি না ছড়িটা ভাঙগা অমনি ওটার ভেতর থেকে ঝকঝকে চারটে মস্তবড় হীরে বেরিয়ে এল। হীরেগুলো সওদাগরকে ফিরিয়ে দিয়ে, চোর এবার হাসতে হাসতে বলল—সওদাগর দাদা! তুমি যে ছড়ির ভেতর করে হীরে মুক্তো নিয়ে যাও তা কি আর আমি জানিনে ভেবেছ? আমি ত প্রথমেই বলেছিলাম তোমার কোন জিনিস চুরি করব না, তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারনি, তার ওপর আবার সত্যি কথাও বলতে পারলে না, তাই তোমার ছড়িটা ভেঙেগ দিয়ে একটু শিক্ষা দিলাম। যা হোক, তুমি ত উজ্জয়িনীর দিকে যাচ্ছ? ওখানকার রাজা বীর বিক্রম বাহাদুরকে বলে দিও যে কাল রাতে আমি চুরি করতে উজ্জয়িনী নগরে যাব—।

উজ্জয়িনীর রাজা বীর বিক্রম ছিলেন অতিশয় প্রজাবৎসল, সৎ, আর গুণগ্রাহী শাসক, তাই ওদেশের সব লোক তাঁকে পিতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করত। সওদাগরের মুখে চোরের খবর শুনে রাজা বেশ একটু আশ্চর্য হলেন, আগে থেকে সংবাদ পাঠিয়ে চুরি করতে আসে এমন চোরের কথা ত শোনা যায় না। মন্ত্রী আর সেনাপতির সঙেগ পরামর্শ করে রাজা, ঐ চোরকে পরীক্ষা করবার জন্যে এক মতলব ঠাওরালেন। সেই রাতে শহরের যত পাহারওয়ালাদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হল, আর ঢ্যাঁড্রা পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল, নগরবাসী সকলে যেন সেই রাতে বাড়ীর সব দরজা খোলা রেখে ঘুমোতে যায়। রাজ্যসুদ্ধ লোক রাজাকে এত বিশ্বাস করত আর ভালবাসত, যে তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ বিনা দ্বিধায় পালন করত। রাত হল, কোথাও কোন চৌকিদার নেই, আর সবারই বাড়ীর দরজা খোলা। রাস্তা জনমানবশূন্য, শুধু রাজা বিক্রম এক ভিখারীর ছদ্মবেশে, ছেঁড়া জামা কাপড় পরে শহরের প্রবেশ পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন সেই আজব চোরের প্রতিক্ষায়।

ঘড়িতে যখন ঠিক মাঝরাত, চোর এসে উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করল। রাজাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—তুমি আবার কে বট হে—? রাজা বললেন—ভাই, আমি এক গরীব ভিখিরি, দূর থেকে তোমায় আসতে দেখলাম, তাই ভাবলাম যদি কিছু ভিক্ষে পাওয়া যায়—। খুশী হয়ে চোর বলল—বেশ বেশ, দুজনে মিলে একসঙেগ যাওয়া যাক চল, যা রোজগার হবে অর্ধেক তুমি পাবে। তুমি ত এখানকার পুরনো লোক, বেশ একজন পয়সাওয়ালা লোকের ঘরে নিয়ে চল দিকি—।

রাজা, ওকে পথ দেখিয়ে এক জমিদারের ঘরে নিয়ে এলেন। দরজা ত হাট করে খোলা, চোর রাজাকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে বলল—'তুমি এখেনে থাক, বিপদ দেখলে মুখে আঙ্গুল পুরে শীস দেবে, আমি এবার ভেতরে গিয়ে দেখি কি পাওয়া যায়—।' চোর দেখল লোহার সিন্দুক রয়েছে গিন্নী মা-র শোবার ঘরে। জমিদার গিন্নীর আবার একটা রোগ ছিল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলা। চোর যখন সিন্দুক খুলছে তখন শুনল গিন্নী ঘুমের ঘোরে বলছেন—কে ভাই তুমি? তোমার নাম কি? পালিওনা যেন, একটু মিষ্টি মুখ করে যেতে—। চোরকে খালি হাতে বেরিয়ে আসতে দেখে রাজা ত অবাক। কৈফিয়ৎ-এর সুরে চোর বলে—কি আর করি বল, গহনাভর্তি সিন্দুকের ডালাটা খুলেও আবার বন্ধ করে ফিরে এলাম, এ বাড়ির গিন্নী ঠাকরুন আমাকে ভাই বলে ডেকেছে, দিদির বাড়িতে কি আর চুরি করা যায়, তুমিই বল না? বরংচ ভাই-এর কাজ হল দিদিকে কিছু উপহার দিয়ে আসা, কি বল? আছে নাকি তোমার ট্যাঁকে কিছু—? বলতে বলতে চোর নিজের হাতের আংটিটা খোলে, রাজা মশাই ওঁর ছেঁড়া পোষাকের জেব থেকে একটা সোনার মোহর বের করে দিলেন। চোর চুপচাপ গিয়ে ঐ মোহর আর আংটিটা জমিদার গিন্নীর

বিছানার ওপর রেখে দিয়ে পালিয়ে এল।

এবার একজন বড়লোক ব্যবসায়ীর বাসায় চোরকে নিয়ে এলেন রাজা। আগের মত দরজায় পাহারা দিতে লাগলেন রাজা। আর চোর অন্ধকারে ভেতরে ঢুকে গেল। মহাজনের বাড়ি সারি সারি সব মালভর্তি বস্তা সাজান আছে। হয়েছে কি অন্ধকারে চলতে গিয়ে, ঐ বস্তায় হোঁচট খেয়ে চোর পড়ে গেছে, আর বস্তার ভেতরের গুঁড়ো গুঁড়ো কি সব চোরের চোখে মুখে ঢুকে গেছে। মুখের ভেতরের জিনিসটা চেটে নিয়ে চোর বুঝল ওটা নুন, সঙ্গে সঙ্গে চোর বাইরে বেরিয়ে এল। রাজাকে বলল—ভাই, এখানেও চুরি করা হল না, ভুলে এ বাড়ির নুন খেয়ে ফেলেছি, চোর হই আর যাই হই, নেমকহারামি ত আর করতে পারিনে। চল, অন্য কোথাও যাওয়া যাক—। চোরের কথা শুনে রাজা মনে মনে খুশী হলেও মুখে বললেন—নাঃ, তোমার মতন ধার্মিক চোরের পাল্লায় পড়ে কি ঝকমারিই করেছি, রাত শেষ হতে চলল, এক পয়সা রোজগার ত হলই না, মাঝ থেকে সবেধন নীলমনি মোহরটাও গচ্চা দিতে হল। যাক গে, এই শেষবার, এবার তোমাকে এখানকার রাজবাড়িতে নিয়ে যাব, ওখানকার সুলুকসন্ধান সব আমার ভাল করেই জানা আছে, কোনো অসুবিধে হবে না—।

দুজনে এবার রাজবাড়িতে এলেন, সব দরজাই হাট করে খোলা, কোথাও কোন প্রহরীর নামগন্ধও নেই। চোর ত সটান ঢুকে গেল। আর সামনেই দেখতে পেল দু ঘড়া সোনার মোহর সাজান আছে। এক এক করে দুটো ঘড়াই চোর বাইরে নিয়ে এল, আর আধা আধি বখরা হিসেবে রাজাকে একটা ঘড়া তুলে নিতে বলল। রাজা কিন্তু কিছুতেই ভাগ নিতে রাজী নন, আর চোরও কিছুতেই ছাড়বে না, অর্ধেক ভাগ দেবেই দেবে। এদিকে হয়েছে কি, রাজার একটা পোষা ময়না ছিল খাঁচায়, পাখিটা ভাল কথা বলতে পারত। গোলমাল শুনে পাখিটার ঘুম ভেঙে

গেল আর হঠাৎই বলে উঠল—এই লোকটা কি বোকা, এঁরই বাড়িতে দাঁড়িয়ে, এঁরই জিনিস, এঁকেই ভাগ করে দিতে চাইছে—শুনেত চোরের চক্ষু চড়কগাছ ! বুঝল, ইনিই উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বীর বিক্রমাদিত্য। রাজাকে নমস্কার করে, জোড় হাতে চোর বলল—যখনই আপনি দিদির বাড়িতে ছেঁড়া পোষাকের জেব থেকে সোনার মোহর বের করে করলেন, তখনই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, যাক, আর কি করা যাবে, আপনার বাড়িতে চুরি করেছি, ধরাও পড়েছি, এখন উপযুক্ত শাস্তির অপেক্ষায় রইলাম—।

রাজা এবার সত্যি সত্যিই মুখে আঙ্গুল পুরে জোরে শীস্ দিলেন, আর, একদিক থেকে চারজন অনুচর, অন্যদিক থেকে, মন্ত্রী, সেনাপতি আর কোষাধ্যক্ষ মশাই এসে হাজির হলেন। একজন অনুচর, রাজাকে ছেঁড়া জামাকাপড় ছাড়িয়ে রাজকীয় পোষাক পরিয়ে দিল। সকলের দিকে চেয়ে, মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলেন—দেখুন আপনারা সকলে, আজ আমি একজন চোর ধরেছি, তবে ইনি সাধারণ চোর নন, এক আজব চোর। কেউ ভাই বলে ডাকলে সে বাড়িতে চুরি করেন না, কারোর বাড়ি নুন খেলে, সেখেনে চুরি করেন না, আর ওঁর কথামত অর্ধেক ভাগ নিতে চাইনি বলে, আমাকে শুধু মারতে বাকি রেখেছেন। এঁর কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার। আমি অবশ্য একটা শাস্তির কথা ভেবেছি। আমার নবরত্ন সভায় একটি পদ খালি আছে, ঐ পদের জন্য আমি এঁকে মনোনীত করলাম। পন্ডিত ব্যক্তি ত অনেক আছেন, একজন, বিবেকবান চোর থাকলে নবরত্ন সভাটা জমবে ভাল। এবার বলুন আপনারা ; মন্ত্রীমশাই আপনি আগে বলুন, এঁকে আপনার তরফ থেকে কিছু শাস্তি দিতে চান কি— ?

মাথা চুলকে মন্ত্রী বলেন—দেখুন রাজামশাই, আপনি মহৎ ব্যক্তি, কারোর ভেতর মহত্ব দেখলেই গলে যান। কিন্তু আমি এ রাজ্যের মন্ত্রী, অনেক কিছু বিবেচনা করে আমায় চলতে হয়। ইনি আপনার রত্ন হবেন খুবই আনন্দের কথা, তবে যতই হোক ইনি যখন চোর, তখন এঁকে চোখের আড়ালে রাখা ঠিক হবে না। আপনার রাজপ্রাসাদ আর আমার গৃহের মাঝখানে যে সুসজ্জিত বিশাল অট্টালিকাটি অনেকদিন ধরে খালি পড়ে আছে, ওঁকে এবং ওঁর পরিবারবর্গকে সেই অট্টালিকায় বসবাস করবার অনুমতি দেওয়া হক, তাহলে আপনি আর আমি দুজনেই ওঁর ওপর কড়া নজর রাখতে পারব—।

এবার এগিয়ে এলেন কোষধ্যক্ষ মহাশয়। তাঁর বক্তব্য হল, মানুষ অভাবে পড়ে তবেই চুরি করে, অভাব মিটে গেলে আর চুরি করবার দরকার কি ? তাই চোর যাতে আর কোনদিন চুরি করবার প্রয়োজন মনে না করে তার জন্যে উনি চোরকে ওঁর দস্তখত করা একটা হুকুম নামা দিয়ে দেবেন, যেটা দেখালে, যে কোন পরিমাণ অর্থ, যখন খুশি, রাজাকোষ থেকে গ্রহণ করা যাবে।

সেনাপতিই বা পেছিয়ে থাকবেন কেন, সবাইকে ঠেলেঠুলে তিনি সামনে এগিয়ে এলেন, চোরকে উদ্দেশ করে বললেন—দেখ বাপু চোর, ডাকাত টাকাত দেখলেই আমার কাজ হল তাকে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলা। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তুমি যখন চোর, তখন মহারাজের যত প্রিয়পাত্রই হও না কেন, আমার কর্তব্য হল যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে বেঁধে ফেলা। আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অমন মেয়ে লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। ভাবছ বুঝি বাপ বলে বাড়িয়ে বলছি, না হে না, এঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেই সত্যিমিথ্যে জানতে পারবে। মহারাজের অনুমতি পেলে, তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে, দড়িদড়ার থেকে আরও কঠিন বাঁধনে তোমাকে বাঁধতে চাই, বুঝলে চোর মশাই—।

শাস্তির বহর শুনে চোরের চোখ তখন কপালে উঠেছে।

মারাদোনা

বস্তি থেকে রাজাসনে এবং নির্বাসনে

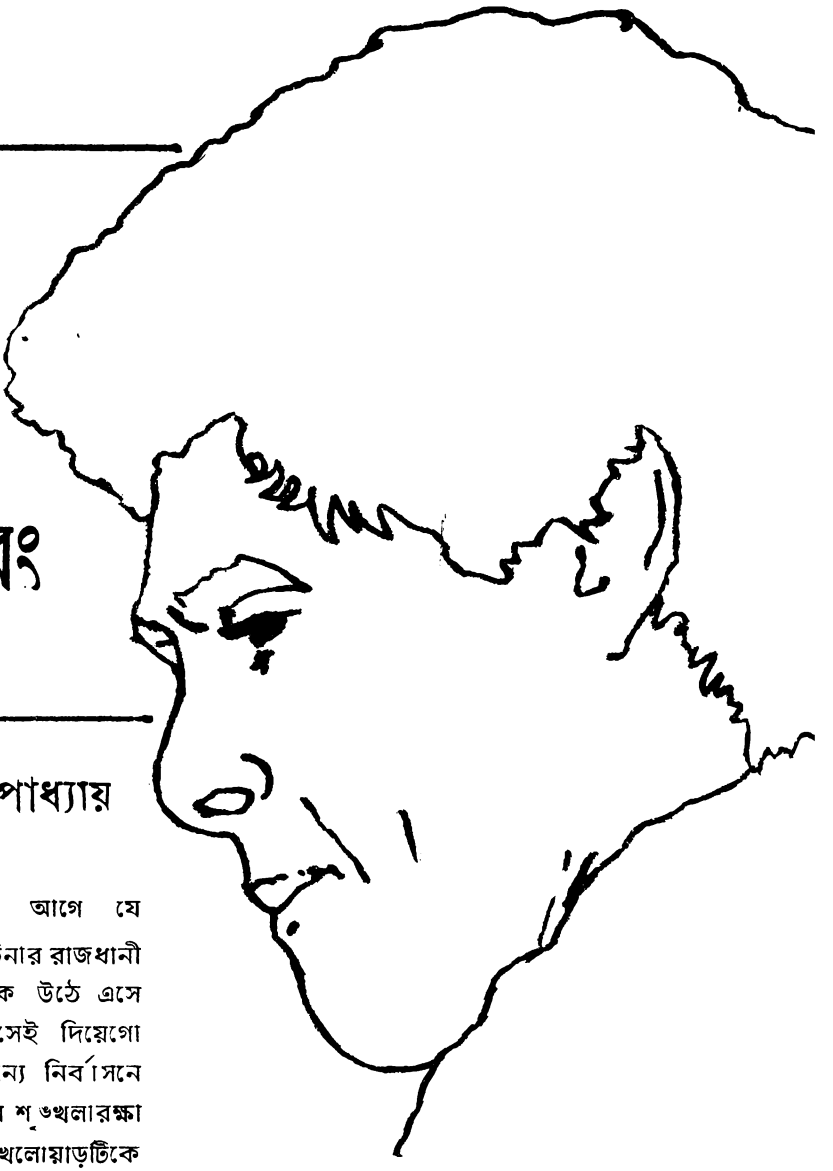

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র আঠারো বছর আগে যে খেলোয়াড়টি আর্জেনটিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ার্সের শহরতলী থেকে উঠে এসে সমস্ত বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন সেই দিয়েগো মারাদোনাকে পনেরো মাসের জন্যে নির্বাসনে পাঠালো ইতালির ফুটবল সংস্থার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়টিকে সম্ভবত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সরে যেতে হলো আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর থেকে। ইতালিরা ৯০য়ে ইতালিকে হারানোর প্রতিশোধ যে এইভাবে নেওয়া হবে তা বোধহয় স্বয়ং মারাদোনাও কল্পনা করতে পারেননি।

পঁচিশ বার পরীক্ষা করেও মারদোনা কোন রকম উত্তেজক কিছু খেয়েছেন কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, আর একবারের পরীক্ষায় অতি সামান্য পরিমাণ কোকেন পাওয়াতেই তাঁকে অতো বড় শাস্তি দেওয়া হলো! অথচ ঐ পরীক্ষাই বলছে খেলার অন্তত কুড়ি ঘন্টা আগে মারাদোনা কোকেন খেয়েছিলেন। কিন্তু মারাদোনা কি খেয়েছিলেন? ব্যথা কমাবার ওষুধ খেলেও ডোপ টেস্ট পজিটিভ হয়। মারাদোনা কি তাই খেয়েছিলেন? যদি ধরে নেওয়া হয় মারাদোনা কোকেনই খেয়েছেন তাহ'লে কি প্রমাণিত হয়? কোকেন এমন কিছু উত্তেজক দ্রব্য নয় যা তেড়ে ফুঁড়ে খেলার শক্তি যোগাবে।

সিওল ওলিম্পিকে বেন জনসন স্টেরয়েড খেয়েছিলেন। স্টেরয়েড অত্যন্ত শক্তিশালী ওষুধ যা শরীরকে উত্তেজিত করে তোলে, বাড়তি শক্তি যোগায়। তাই বেন জনসনের কাছ থেকে শত মিটার দৌড়ের সোনার মেডেল কেড়ে নিয়ে

দেওয়া হয়েছিলো কার্লিউইসকে। বেন জনসন হারিয়েছিলেন বিশ্বের দ্রুততম মনুষের সম্মান এবং তা অতি সংগত কারণেই।

কিন্তু মারাদোনা ?

মারাদোনার সত্যিই কি অপরাধ তা বোঝা গেলো না। মারাদোনা অবশ্য এই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করবেন। কলঙ্ক মোচনের জন্যে দরকার হলে কোর্টে যাবেন। হয়তো শাস্তি বদলে যাবে—কিন্তু মারাদোনা বোধহয় আর কোনদিন তাঁর ক্লাব নেপোলিতে খেলতে যাবেন না। যদিও তাঁর সঙ্গে নেপোলির চুক্তি ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এবং অখ্যাত ফুটবল মহলে তেমন হাঁকডাক না থাকা দল নেপোলিকে শিরোনামে এনে দিয়েছিলেন একা মারাদোনাই। তাঁরই জন্যে গত চার বছরে দু দুবার ইতালির ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নেপোলি। শুধু তাই নয় নেপোলিকে ইউফা কাপও এনে দিয়েছেন মারাদোনা। দিয়েগো মারাদোনাকে আনার আগে সারা পৃথিবীতে নেপোলির তেমন কোন পরিচিতিও ছিলোনা। অথচ মারাদোনা আসার পর রাতারাতি সব কিছু বদলে গেলো। গেট সেল থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই বেড়ে গিয়েছিলো হু হু করে। এগিয়ে এসেছিলেন স্পনসররা। নেপলসের মানুষ মেতে উঠে-ছিলেন মারাদোনাকে নিয়ে। গত বিশ্বকাপের সময় সমস্ত ইতালি যখন মারাদোনার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলো নেপলসের মানুষ তখনো কিন্তু দিয়েগোর পেছনে ছিলো। তারা মারাদোনাকে পুজো করত। রোমের মারাদোনা বিদ্বেষকে পাত্তা দেয়নি নেপলসের মানুষ। বিশ্বকাপের পর মারাদোনাকে তারা দিয়েছিলো নাগরিক সম্বর্ধনা। কিন্তু নেপলস ছাড়া ইতালির অন্য অংশের মানুষ; খবরের কাগজগুলো এমন কি ইতালি-ফুটবল সংস্থার কর্তারাও ছিলেন মারাদোনার বিরুদ্ধে। কাগজে কাগজে চলছিলো তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার। মারাদোনাকে হেয় করার জন্যে অনেক কিছুই লেখা হলো। এমন কোথাও লেখা হলো যে ইতালির মাফিয়া চক্রর সঙ্গে মারাদোনারা যোগাযোগ আছে। কোন কিছুতেই যখন কিছু হলো না, উল্টে খেলার মাঠে মারাদোনা আবার দুরন্ত হয়ে উঠতে লাগলেন তখনই চরম আঘাতটি হানা হলো।

গত ১৭ মার্চ বারির সঙ্গে খেলার পর মারাদোনার ডোপ টেস্ট হয়। প্রমাণ পাওয়া যায় খেলা আরম্ভর প্রায় কুড়ি ঘণ্টা আগে মারাদোনা কোকেন জাতীয় কিছু খেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ দ্রব্য খেলার উৎকর্ষ বাড়ায় না। তবু ঐ জন্যে পনেরো মাস সাসপেণ্ড করা হলো মারাদোনাকে। অর্থাৎ ১৯৯২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মারাদোনা খেলতে পারবেন না।

এতো বড় শাস্তি দেওয়া হলো; অথচ কমিটির সদস্যরা সকলে একমত হতে পারেননি। কমিটির একজন সদস্য পাওলো সিনিসচালচি তো প্রকাশ্যেই তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শাস্তিটা বড্ড বেশি হয়ে গেলো। বিশেষ করে পেরুজি আর কার্নেভেলের কথা যদি ধরা হয়।

গত অক্টোবর মাসে রোমার দুই খেলোয়াড় আন্দ্রেয়া কার্নেভেল আর অ্যাঞ্জেলো পেরুজি ডোপ টেস্টে দোষী প্রমাণিত হন। দু'জনকেই মাত্র ১২ মাসের জন্যে সাসপেণ্ড করা হয়। ওঁরা দু'জনেই শক্তিবর্ধক স্টেরয়েড জাতীয় কিছু খেয়েছিলেন। অথচ মারাদোনার বেলায় পাওয়া

গেছে আতি সামান্য পরিমাণে কোকেন।

শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির প্রধান ডি' আলেসিও বলেছেন, কোকেন নিষিদ্ধ দ্রব্য। কম বেশির প্রশ্ন নয়, ডোপ টেস্টে পাওয়া যখন গেছে— মারাদোনাকে তখন শাস্তি পেতেই হবে।

এই কথা থেকেই বোঝা যায় ব্যাপারটার পেছনে আছে গভীর চক্রান্ত। তাঁর খেলোয়াড় জীবন শেষ করে দেবার চেষ্টা যে অনেকদিন থেকে চলছে মারাদোনা তা জানতেন। তাই তিনি বারবার ইতালি থেকে চলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেপোলির সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিলো ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। তাই বাঁধা ছিলো তাঁর হাত-পা। কিন্তু ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মোটেই ভালো যাচ্ছিলো না। অনুশীলনে না আসা, দেরি করে আসা, দলের সঙ্গে মস্কো যেতে অস্বীকার করা ইতালির জন্যে তাঁকে ৫০,০০০(হাজার) স্টার্লিং পাউণ্ড জরিমানা দিতে হয়েছে। তাই বোধহয় গত একমাস ধরে মারাদোনাকে শাস্তি দেবার ব্যাপারটা যখন পাকা হচ্ছিলো তখন নেপোলির কর্তারা চুপচাপ ছিলেন।

কিন্তু মারাদোনাহীন নেপোলির অবস্থা কি হয়েছে তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। ক্লাবটার অবস্থা এখন ছন্নছাড়া। হারছে একটার পর একটা খেলায়। মারাদোনা একা যে কতোটা দায়িত্ব নিয়ে খেলতেন তা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মারাদোনার অনেক দোষ আছে ঠিকই কিন্তু ভুললে চলবে না যে তিনিই বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। সাসপেণ্ড হবার আগে তিনি খেলছিলেনও দারুণ। আরও একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে মারাদোনা উঠে এসেছেন অত্যন্ত গরিব ঘর থেকে। ছোট বেলায় খেতে পর্যন্ত পেতেন না। খেলাপড়া শেখার কোন সুযোগই তাঁর ছিলো না। ফুটবল তাঁকে যশ, প্রতিপত্তি, অর্থ সবই দিয়েছে, শিক্ষা দিতে পারে নি। তাই তিনি একটু রুক্ষ, সব সময় কথাবার্তায়ও ঠিক থাকে না। ফলে ভুল বোঝেন অনেকে।

সে যাই হোক ডোপ টেস্টে ধরা পড়ার পরের দিনই মারাদোনা তাঁর স্ত্রী ক্লডিয়া আর দুই মেয়েকে দেশে পাঠিয়ে দেন। তারপরের দিন নিজেও ফিরে যান। দেশে ফিরে মারাদোনা বাড়ি থেকে ধরতে গেলে বেরোনই নি। বাবার সঙ্গে মাছ ধরে সময় কাটিয়েছেন আর বাড়ির মধ্যে থেকেছেন। বাড়ির বাইরে হত্যে-দিয়ে বসেছিলেন সাংবাদিকরা। যদি মারাদোনার মুখ থেকে কিছু বার করা যায়। জানালা বন্ধ করতে এসে খুবই পরিচিত একজন সাংবাদিককে দেখে মারাদোনা শুধু বলেছিলেন, এর আগে পঁচিশবার ডোপ টেস্ট করেও ওরা কিছু পায় নি। আর এবার

সাংবাদিক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, এবার কি করবে ?

মামলা হবে !

ইতালিতে আর যাবে ?

মামলার জন্যে যদি দরকার হয় তাহ'লেই শুধু যাব্যে,না হ'লে আর কোনদিনই যাবো না।

আর্জেনটিনা থেকে যে সব খবর এসেছে তাতে জানা গেছে, মারাদোনার শরীর ক'দিনেই খারাপ হয়ে গেছে। তিনি কোথাও যেতে চাইছেন না। তাঁর পুরোনো ক্লাব বোকা জুনিয়ার্সের কর্তারা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন একটি প্রদর্শনী খেলা দেখতে যাবার জন্যে। মারাদোনা রাজী হন নি। আসলে যে কলঙ্কের বোঝা তাঁর ওপর চাপানো হয়েছে তার ভার সহ্য করতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় দিয়েগো আরমাণ্ডো মারাদোনা।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর মানুষ একটা কথাই ভাবছেন, এই পনেরো মাসের সাসপেনশন কি মারাদোনার খেলোয়াড় জীবন শেষ করে দেবে ? মারাদোনা কি আর কোনদিন খেলবেন না ? এতো বড় একজন খেলোড়ের জীবন এই রকম কলঙ্কিতভাবে শেষ করে দেবার ব্যাপারে ফিফা কি কিছুই করবে না।

ইতালি যে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে মারাদোনার খেলোয়াড় জীবন এইভাবে শেষ করে দেবে তা বোধহয় কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। এখন শুধু দেখার, মামলা হলে তার রায় কী বেরোয়। মারাদোনার ম্যানেজার বলেছেন, আমাদের হাতে এমন অনেক তথ্য প্রমাণ আছে যা সকলকে চমকে দেবে। আমরাও তাই চাই। সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে কলঙ্ক মুক্ত হোন দিয়েগো মারাদোনা। ফাঁস হয়ে যাক, ইতালি ফুটবল সংস্থার সমস্ত চক্রান্ত। মাঠের রাজা মাঠ ছাড়ুন রাজার মতোই—কলঙ্কিত নায়কের মতো নয়।

উৎসবের খবর

ইলেকশনের ডামাডোলে যাতে অসুবিধা না হয় তাই উৎসবের দিন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হল।

১লা জুন শনিবার, বিকেল ৫॥টা, সন্দেশের লেখকেরা অভিনয় করবেন, আরো নানা মজা করবেন, সন্দেশীরা দেখবে।

২রা জুন, রবিবার, বিকেল ৫টা

গ্রাহকদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী, মজার সাজে সাজা আর স্বরচিত ছড়া, কবিতা ও ছোট ছোট গদ্য রচনা পড়া।

* অনুষ্ঠান দুটি হবে ত্রিকোণ পার্কে, শরৎ-সমিতির সভাগৃহে (তিনতলায়) রাসবিহারী এভিনিউতে সন্দেশ কার্যালয়ের সামনে।

*** ১লা মে'র মধ্যে লেখা আর ছবি জমা দাও**

একই নম্বর একাধিক গ্রাহক থাকলে সবাই আলাদাভাবে যোগ দেবে। একাধিক রঙিন বা শাদা কালো ছবি জমা দিতে পার। একটার বেশি মনোনীতও হতে পারে। বেশ বড় করে আঁকো।

একাধিক লেখাও জমা দিতে পার। সবচেয়ে ভালোটা মনোনীত হবে।

* **১২ই মে রবিবার বিকেল পাঁচটার থেকে ছটার মধ্যে** এসে ফলাফল জেনে যেও। নির্বাচিত লেখা পড়ে শুনিয়ে যেও।

* উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, সত্যজিৎ রায়, অথবা সন্দেশের কোনো লেখকের সৃষ্ট কোনো চরিত্র সেজে, তার ভূমিকায় দুএক মিনিট স্টেজে অভিনয় করতে হবে। (ছোট একটা সাজ ঘর আছে)

কি সাজবে সেটা ১২ মের মধ্যে চুপি চুপি আমাদের বলে যেও।

* **১২ই মে রবিবার থেকে ২৬শে মে রবিবারের** মধ্যে প্রত্যেকে যে যার আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করে নিও। সন্দেশের গ্রাহকেরা আর ছোট গ্রাহকদের সঙ্গে একটি করে অভিভাবক কার্ড পাবেন।

---

৪২ পৃষ্ঠার উত্তর—

দাশু বলেছিল, 'ওটা কেমন চামচ?'

প্রোফেসর বলেছিলেন, 'বেলচাবাহাদুর!'

ডাইনে পাগলা দাশুর ছবিতে

১। খোকার মাথায় চুল বেশী
২। চোখের চাহনি অন্যরকম
৩। জামার হাতায় বাহার কম
৪। জামায় ফুটকী কম
৫। জুতোর বাহার কম
৬। বেলচার হাতল অন্যরকম
৭। মাটীতে নুড়ি প'ড়ে নেই
৮। আকাশের পাখী অন্য জায়গায় উড়ছে।

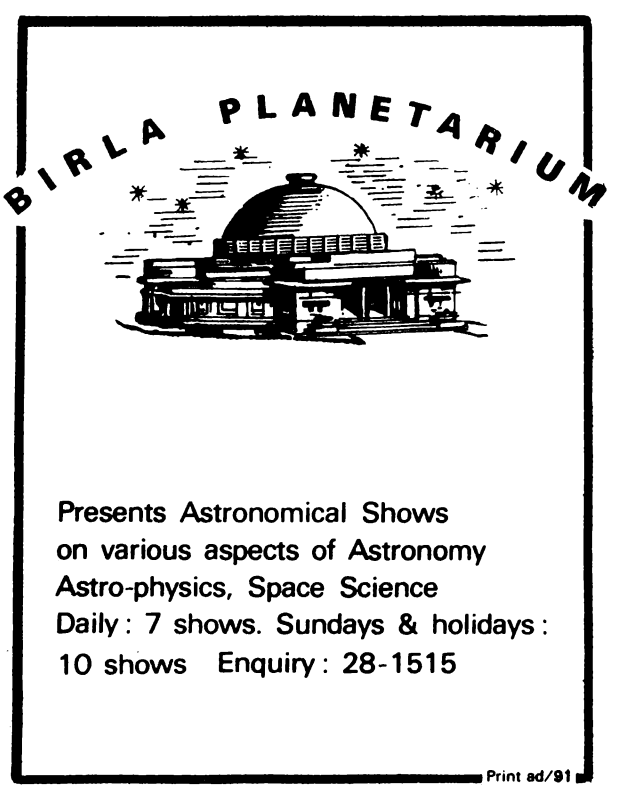

নতুন বছরের চিঠি

ভাই সন্দেশীরা,

এবার আমাদের নতুন বছর শুরু হচ্ছে আনন্দ উৎসব দিয়ে। কিসের উৎসব সে তো আগেই জেনেছ—

প্রথমতঃ নতুন পর্যায়ের সন্দেশের ৩০ বছর পূর্ণ হল। ৩০ বছর আগেকার সন্দেশের প্রথম মলাটও আবার ফিরিয়ে আনলাম। তোমরা তো সেটা দেখনি। যাদের বাড়ি পুরনো সন্দেশ আছে সেরকম দুএকজন দেখে থাকতে পার।

তাছাড়া এবছর সুবিনয় রায়ের একশ বছর পূর্ণ হবে। তিনি দুবার সন্দেশ সম্পাদনা করেছিলেন,—দাদা সুকুমার মারা যাবার পরে ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত, আবার ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত। রহস্যের গল্প, হাসির গল্প, ছোট্টদের জন্য গল্প ছাড়াও সুবিনয় রায়ের লেখা ছড়া, মজার প্রবন্ধ, ধাঁধাঁ, ইত্যাদি রকমারি জিনিস আমরা মাসে মাসে ছাপাচ্ছি। দু একটা উল্টো-পাল্টাও ছাপা হয়েছে—যেমন সুকুমার রায়ের লেখা উকিলের বুদ্ধি ভুল করে সুবিনয়ের নামে ছাপা হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছ সুকুমার রায়ের বাজে গল্প, হারুর পড়ে যাওয়া ভুল করে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর নামে ছাপা হয়েছে। ওটা সত্য ঘটনা। দুজনেই সেই গল্প লিখেছিলেন। কার্তিক মাসে সুবিনয় রায়ের জন্মশতবর্ষ সংখ্যা ছাপা হবে, তখন তোমরা আরো অনেক কথা জানতে পারবে। কেমন লাগছে জানিও।

উৎসবের খবর ত পেলে? সবাই এই উৎসবে যোগ দিও তবেই মজা জমবে।

তিন-তিনটে নতুন প্রতিযোগিতা পেলে—তাতেও সবাই যোগ দাও, তাহলে সবাই মজা পাবে।

নতুন বছরে তোমরা নতুন ক্লাসে উঠেছ। নতুন বছরে অনেকে সন্দেশকে আর সন্দেশীদের শুভকামনা জানিয়েছ। সুন্দর সুন্দর কার্ড এঁকে পাঠিয়েছ।

তোমরা সন্দেশের শুভকামনা জেনো। ভাল থাক, ভাল খাও আনন্দ কর। ইতিঃ—

সঃ সঃ

খুশ খবর

* তোমাদের প্রিয় লেখক মঞ্জিল সেন এ বছর **NCERT** প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর 'গোরাচাঁদ' বইটির জন্য। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

ময়না কেন কয়না কথা?

নন্দিতা দাশগুপ্ত

বাজার থেকে কিনে আনল—ময়না একটা
নিন্নাই ;
কথা শেখানো শুরু হল তার রাত নাই বা
দিন নাই।
ময়না ছানা খায়না ছানা, চানা, দানা
কিচ্ছুটি—
নিন্নাই তাকে শেখাবেই, তার হাতে আর
নেই ছুটি।
মা বলেন, বাবাও বলেন, "ভয় পেয়েছে
পাখিটা—
আজকে ওকে দাওনা ছুটি, শিখিও কাল
বাকিটা।"
নিন্নাই তবু ছাড়বে নাকো, জেদ চেপেছে
তারও যে !
চেপে চুপে আরও শেখায়, জোর করে সে
আরও যে।

পাশের বাড়ির রানুদি তার তোতা দিয়ে
'নানু' বলায়,
ময়না যদি 'নিনাই' না কয়, মানটা যে তার
থাকাই দায় !
উঠে প'ড়ে তাই লেগেছে পাখির পিছে
মাষ্টার—
'গুড মর্নিং', 'থ্যাংকু' নাহোক্ শুধুই ডাকুক্
নাম তার ?
একে একে দিন কেটে খায়, ময়না কথা
কয়না।
"দূর করে দি বোবাটাকে, যন্ত্রণা আর
সয়না !"
ব'লে নিন্নাই যেই খুলে দেয়—খাঁচার দরজা
একটু—
ফুড়ুৎ করে ওড়ে পাখি, বলে "নিনাই
ট্যাংকু !!"

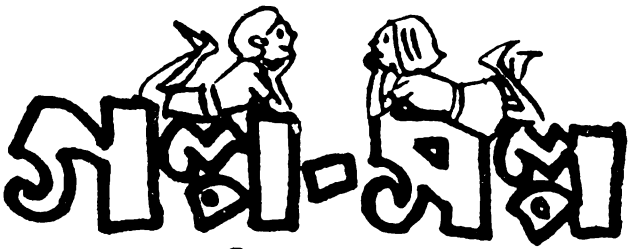

লীলা মজুমদার

স্বদেশীরা আজকাল কি রকম ভাবনা চিন্তা জল্পনা-কল্পনা করছে জানতে ইচ্ছে করে। আমি তো কিছু না কিছু না করে বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রথম চক্ষু মেলে দুনিয়া দেখে, এখন শেষ দশক অবধি টেনে টেনে এনে ফেলেছি। বলতে বাধা নেই যে গত ৮৩ বছর ধরে যা দেখেছি যা শুনেছি, তাতে একেবারে তাজ্জব বনে গেছি!

১৯৪৭ সালে দেশটা মহোৎসব করে স্বাধীন হল এবং বিশ্বাস কর আর নাই কর, ঐ সায়েবরাই শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির সঙ্গে ভাবসাব করে স্বাধীনতাটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেল। বলা বাহুল্য যাবার সময় এমন ব্যবস্থাও করে গেল যাতে আমাদের বড্ড বেশি বাড় বেড়ে শেষটা না ওদের সঙ্গেও টেক্কা দিই। তাই তিন দিকে তিনটি কাঁটা ঝোপেরো বন্দোবস্ত হল। পশ্চিমে পাকিস্তান, পুবে বাঙ্গলাদেশ আর দক্ষিণে শ্রীলংকা। সেই ইস্তক আমরা চোখে মুখে পথ দেখছিনে। যারা হতে পারত অন্তরঙ্গ তারাই, হয়ে দাঁড়াল প্রতিদ্বন্দ্বী! আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্মপরায়ণতা, অধ্যবসায় সবই ছিল, তবু কিছু করে উঠতে পারলাম না। ওরা আমাদের দুনিয়ার সব চাইতে পেছিয়ে পড়া দেশের মধ্যে একটি বলে প্রচার করে।

মনে মনে কি ভাবে তা জানি না। তবে দেখি তো আমাদের সেরা গুণীদের বৃত্তি দিয়ে, চাকরি দিয়ে, লুব্ধ করে। আর আমরাও তেমনি যে, যে করে অ্যামেরিকা গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে জীবন কাটাই আর গরীব স্বদেশকে নিয়ে বিদ্রূপ করি! যারা দেশে থেকে গেছি, তাদেরও মনের মান ক'ত নেমে গেছে তা অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকা খুলে দেখলেই বোঝা যায়! আমরা সব চাইতে ভক্তি করি রাজনীতি ওয়ালাদের, যারা নাটক বা ফিল্ম করে তাদের আর খেলোয়াড়দের। জ্ঞানী-গুণীদের জন্য আমরা ততটা কেয়ার করি না।

আরো আছে। এক দল ক্ষমতার জন্য লালায়িত, আরেক দল টাকার জন্য। দুজনার মধ্যে অনেক সময় ভাবসাবও দেখা যায়। তখন নতুন বাড়ি ভেঙে পড়ে; পথে পথে জনতার দুই দলে ভাগ হয়ে, হানাহানি, খুনোখুনি লাগায়! এই তো হামেসাই দেখা যায়।

অবিশ্যি বিদেশীরাও কম যায় না। তারা লক্ষ লক্ষ লোক আর আধুনিকতম মারণাস্ত্র লাগিয়ে দেশকে দেশ ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কোটি কোটি টাকা দু-চার দিনে উপে যায়। দু-দলের এন্তার ক্ষতি হয়! তারপর মিটমাট হয়। তার পরেই এর পরের বারের মৎলব দু-পক্ষই আঁটতে শুরু করে দেয়।

তোমাদের তো ভাই তা করলে চলবে না! তোমাদের হবে গিয়ে গড়ে তোলার কাজ! কি কি করলে সর্বনাশ হয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। এবার কি কি করলে একটা বলিষ্ঠ জাত গড়ে তুলতে পার, সে দিকে মন দাও। জান তো বাঙালীদের হদ্দ কুঁড়ে এবং বাক্-সর্বস্ব বলে একটা দুর্নাম আছে? সেটি এবার ঘুচোও।

কেন পারবে না? নিজের চোখে দুটো মহাযুদ্ধের বিবরণী দৈনিক কাগজে দেখেছি। বাঙালী মিলিটারি অফিসার আর সৈনিকরা কি বীরত্বই না দেখিয়েছে। কতজনে প্রাণ দিয়েছে। কেন দিয়েছে? যে গৌরবময় ভবিষ্যতের জন্য দিয়েছে, তাকে তোমরা এবার প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগে যাও। তোমাদের জীবন ধন্য হক।

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

INDIA
TOURISM YEAR 1991

আবার প্রশংসা

গত ৫ই এপ্রিল শ্রী মোহন ধারিয়া, ডেপুটি চেয়ারম্যান, যোজনা কমিশন, মেট্রোরেলে ভ্রমণ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা—

"কলকাতার মেট্রোরেলে চড়ে অভিভূত। এত পরিচ্ছন্ন, এত শৃঙ্খলাপূর্ণ, আর কি সুন্দর পরিবেশ। কলকাতার মেট্রোর জন্য ভারত গর্ব করতে পারে—"

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ই এপ্রিল, ১৯৯১

কলকাতাবাসীর প্রেরণা ও সহযোগিতায়ই কলকাতা মেট্রোরেলের এই প্রশংসা লাভ সম্ভব হয়েছে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

I care for you. You care for Metro.

ABC/MR/91

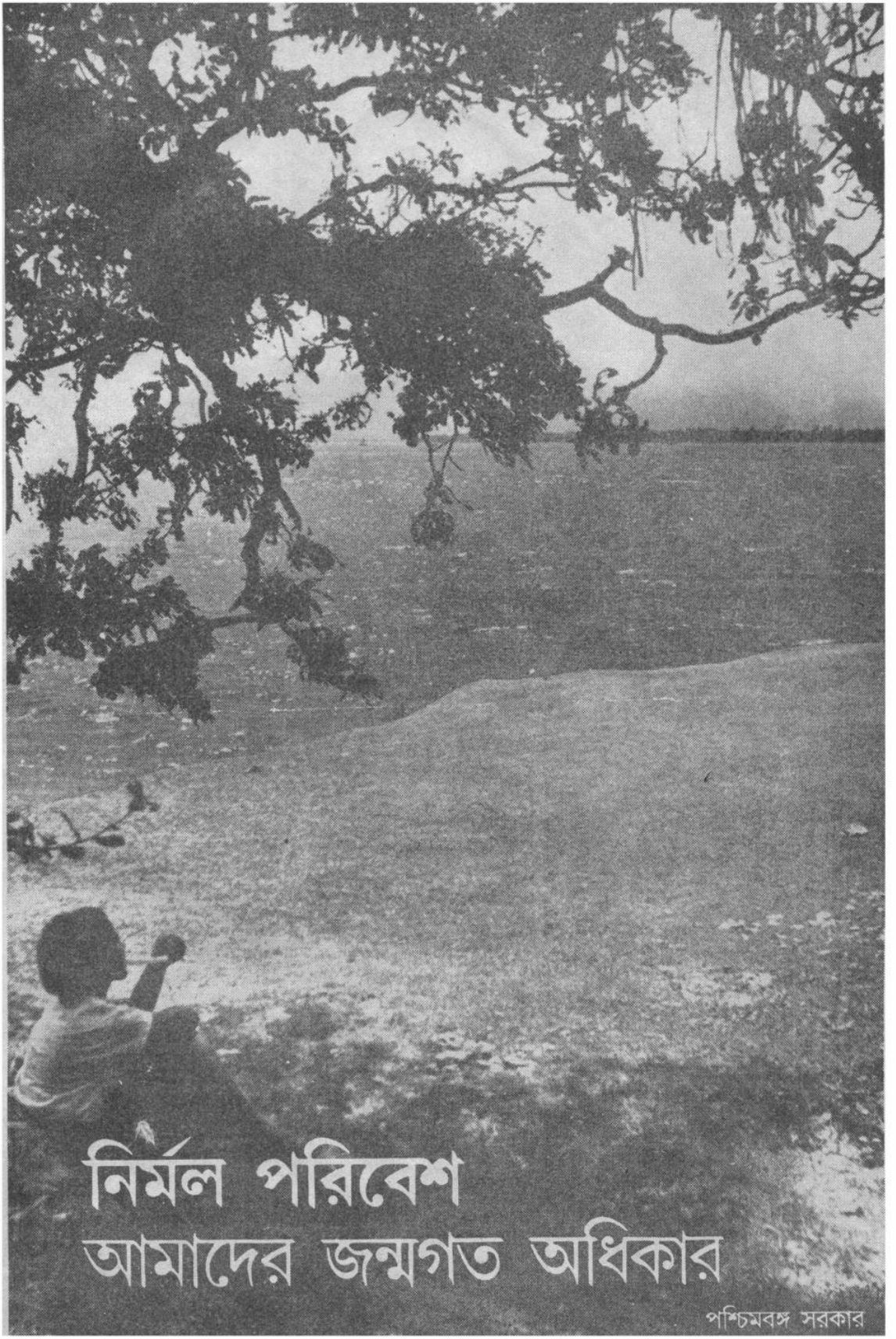
নির্মল পরিবেশ
আমাদের জন্মগত অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শোরুম : লিণ্ডসে স্ট্রীট, লেক মার্কেট, চাকুরিয়া, কলকাতা এয়ারপোর্ট, বারাসত, হাওড়াসাবওয়ে, শ্রীরামপুর, বারুইপুর, বনগাঁ, হলদিয়া, শ্রীনিকেতন, রায়গঞ্জ, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, সিউড়ী, দার্জিলিং, মালদা, শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, নিউ দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, জয়পুর, মাদ্রাজ, পুরী, মাণিকতলা, গুসকরা, বহরমপুর।

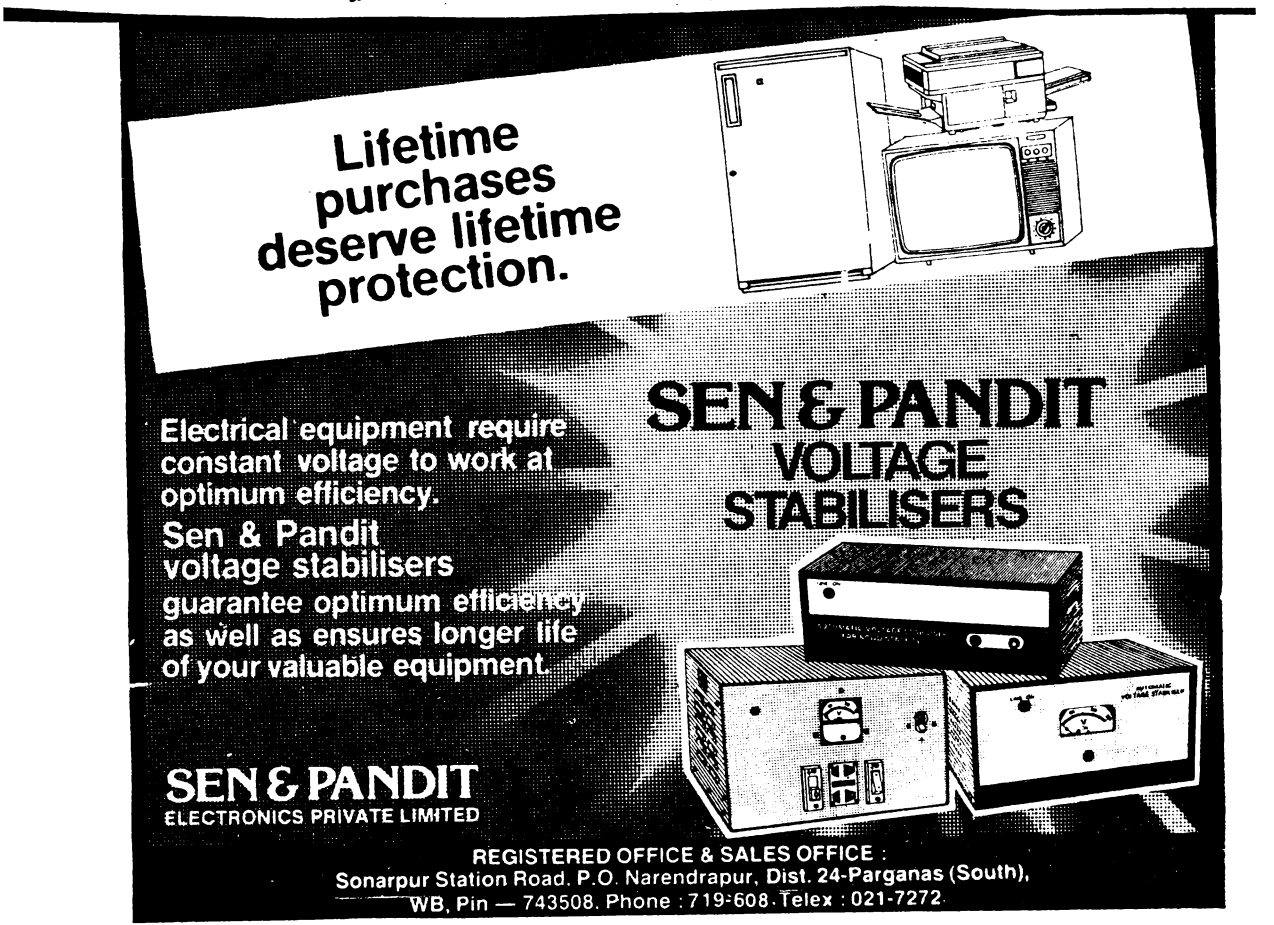

সত্যজিৎ রায়ের

গোয়েন্দা ফেলুদার সব নতুন রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

নয়ন রহস্য

দাম ১৫·০০

নয়ন নামে ছেলেটিকে হঠাৎই ভর করে অলৌকিক ক্ষমতা। নির্ভুলভাবে সে বলে দিতে থাকে অজানা সব সংখ্যা। কার বাড়িতে কটা ঘর, কে কত নম্বর পেয়েছে পরীক্ষায়, কার ব্যাঙ্কে কত টাকা, কত নম্বর ঘোড়া জিতবে রেসের মাঠে—এমন সব, সমস্তকিছু ছবির মতো দেখতে পায় নয়ন। সুনীল তরফদার নামে এক জাদুকর নয়নকে হাজির করে প্রকাশ্য মঞ্চে। নয়নের এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা জেনে তাকে নিজেদের কাজে লাগাতে চায় কয়েকজন লোভী লোক। নয়নের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন ফেলুদা। সঙ্গে তোপশে আর জটায়ু। এমন চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা বুঝি আগে হয়নি ফেলুদাদের। একে তো একাধিক প্রতিপক্ষ, তায় একেকজন একেক ধরনের। সুদূর মাদ্রাজ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে তারা। এরই মধ্যে ঘটে গেল একটি খুন, সেইসঙ্গে নয়ন নিপাত্তা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয়ী হলেন ফেলুদাই। কীভাবে, তাই নিয়েই এই জমজমাট 'নয়ন রহস্য'।
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সত্যজিৎ রায়।

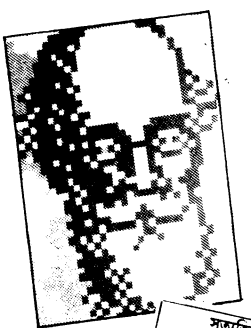

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বই : গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেনচার ॥
বাদশাহী আংটি ১২·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ১০·০০ সোনার কেল্লা ১২·০০ বাক্স-রহস্য ১০·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ১০·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ১২·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ১২·০০ ফেলুদা এন্ড কোং ১৬·০০ গোরস্থানে সাবধান ১৫·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ১২·০০ হত্যাপুরী ১০·০০ যত কান্ড কাঠমাণ্ডুতে ৮·০০ টিনটোরেটোর যীশু ১০·০০ ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু ১৫·০০ দার্জিলিং জমজমাট ১২·০০ ডবল ফেলুদা ১৫·০০

প্রোফেসর শঙ্কুর তাজ্জব কাহিনী ॥
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ১০·০০ সাবাস প্রফেসর শঙ্কু ১০·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ১২·০০ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ১২·০০ শঙ্কু একাই ১০০ ১৪·০০

নানা রসের গল্পগ্রন্থ ॥
এক ডজন গপ্‌পো ২০·০০ আরো এক ডজন ২০·০০ আরো বারো ১২·০০ এবারো বারো ১৫·০০ মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প ১০·০০ একের পিঠে দুই ২০·০০ তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ ১০·০০ ব্রেজিলের কালো বাঘ (অনূদিত) ১৫·০০

অন্য স্বাদের উপন্যাস ॥ ফটিকচাঁদ ১৬০০
স্মৃতিকথা ॥ যখন ছোট ছিলাম ২৫·০০
অনুবাদ-কবিতা ॥ তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম ১৬·০০
রূপকথা ॥ সুজন হরবোলা ২০·০০
সম্পাদিত গ্রন্থ ॥ সেরা সন্দেশ ৮০·০০

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

লড়াই হয়েছিল এ দেশের বনবাসীদের সাথে দূরের দ্বীপবাসীদের। বনের ভেতর লড়াই করে বনবাসীরা যখন জিতে যাবার মুখে, তখন দ্বীপবাসীরা বুঝে গেল, বন সাফ না করলে, এ লড়াইে তাদের জেতার আশা নেই।

বন সাফ করা মানে গাছ কেটে সাফ করা। তাই, সেভাবে বন সাফ হল। বনবাসীরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ না পেয়ে হেরে গেল। কিন্তু বন হারাবার দায় এখন আমাদেরই ভুগতে হচ্ছে।

বন কেটে যারা সাফ করেছিল, তারা ত চলে গেল। খোয়াই ডাঙ্গা রয়ে গেল খোলা আকাশের নিচে। রোদে মাটি ঝুর ঝুর হলো, আর বৃষ্টির জল সে মাটি বয়ে নিয়ে ফেলল নদীতে। নদীর জলে পলি বেড়ে গেল বটে, কিন্তু যে জমির উপরের মাটি ধুয়ে গেল তার উর্বরতা রইল না। অনেক কষ্টেও আর বন হল না সেখানে।

যে বনের কথা বলছি, ধর, তার নাম 'গনগনি'। অনেক কথা আছে দুর্ভাগা গনগনির। যখন রোদ্দুরে পুড়ে খাক হতো গনগনি, শুধু রাখালেরা তখন ছাগল নিয়ে আসত চরাতে। এবড়ো খেবড়ো লাল কাঁকড় মাটির বুকে যেটুকু বা ঘাস উঠে সবুজ ছোঁয়া ফোটাত, ছাগলেরা গোড়া সুদ্ধ মুড়িয়ে তা খেয়ে নিত। অসার মাটি পড়ে থাকত। এমনি করে গনগনি, বন থেকে মরু মাঠ হতে বাকি রইল।

তুমিই বল, গনগনিকে কি এমন করে ফেলে রাখা চলে? কি করা যায় বলতো!

যাঁরা মাটির গুণ বোঝেন, হাওয়া জল আর গাছের সম্পর্ক কি জানেন, তাঁরা গণগনির ভার নিয়েছেন। নতুন করে, যেখানে যেমনটি দরকার যা মানায় তেমন গাছ লাগানো শুরু হলো। রাখালেরা গরু ছাগল চরাবার জন্য সীমানা ঠিক করা জায়গা পেল। বৃষ্টির জল আটকে রইল ছোট ছোট পুকুরে। গাছ বুনবার সাথে সাথে পুকুর কাটা খাল কাটা হয়ে গেল, যাতে ডাঙ্গার মাটি ধুয়ে বাইরে না যায় নদীতে পলি হয়ে। পলি দিয়ে মাটি, রুখু মাটি ঢাকা হলো যেখানে দরকার সেখানেই।

শুকনো পাতা গাছের গোড়ায় ঝরে পড়লে সেখানেই মাটির সাথে মেশে। মাটিতে তখন কিছুটা ভেজা ভাব আসে। কেননা পাতার চাদরে মাটি ঢাকা বলে রোদ ততটা পৌঁছতে পারে না নীচে। মাটি শুকোতে দেরী হয় বলে, কিছু ঘাস কিছু গাছ বড় হয়ে সবুজ ছায়া ফেলেছে গনগনির ডাঙ্গায়। শিগগিরি গনগনির মাঠ গনগনির বন হয়ে যাবে।

কিন্তু এখনো অনেকখানি সবুজে ভরা বাকি। কল্পনায় যা দেখছি তার চেয়েও বেশি। কেননা, এমন করে দরদ দিয়ে কাজ করার মত প্রকৃতি পড়ুয়ার সংখ্যা তত নেই। তার আগে, পশুপাখি গাছপালা পোকা মাকড় জল হাওয়ার হাবভাব বুঝতে হবেত। তা যদি চাও, তবে, প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর, সন্দেশ কার্য্যালয়ের ঠিকানায় চিঠি লিখে জানাও, আমি প্রকৃতি পড়ুয়া হতে চাই। কিংবা চলে এসো—

প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালায়
সন্দেশ কার্য্যালয়ে, প্রতি মাসের প্রথম রবিবার
বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা।

—জী: ম:

সাজুন নতুন সাজে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

জামদানী, টাঙ্গাইল, সুতি ও সিল্ক শাড়ী, ছাপা শাড়ী, ড্রেস মেটিরিয়াল, শালোয়ার কামিজ পিস্, ধুতি, রেডিমেড পোষাক ও গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি।

ABC/T/1008/90

শর্মিলা স্মৃতি পুরস্কার

প্রায় ১১ বছর হয়ে গেল সন্দেশের ৯২০ নং গ্রাহিকা শর্মিলা মুখোপাধ্যায় ১৬ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নানা বিষয়ে উৎসাহ ছিল তার, পড়াশুনা, বিজ্ঞানচর্চা, নাচগান, বাজনা, খেলাধূলা, ছবি আঁকা, ইংরাজী ও বাংলা লেখা সব কিছুই সে ভালবাসত আর খুব ভাল পারত। নাচ-গান, খেলাধূলা, ছবি আঁকা সব বিষয়ে প্রাইজ পেত। স্কুলে সে পড়াশোনায় প্রথম হত, অন্যান্য বিষয়েও।

শর্মিলার বাবা মা তার স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রত্যেক বছর সন্দেশের গ্রাহক গ্রাহিকাদের ১৫০.০০ পুরস্কার দিচ্ছেন। প্রত্যেক বছরের শেষে পরের বছরের প্রতিযোগিতার বিষয় ঘোষণা করা হয়।

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় 'অংশ-হারা ছবি।' নীচের দৃষ্টান্তটি দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে বিষয়টা কি।

এ ছবিটি দেখ্‌লে মনে হয় কয়েকটি ছেলে ধপাধপ্‌ পড়ে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু তা' নয়। ছবিটির বিষয় হচ্ছে 'টাগ্‌ অব্‌ ওয়ার'। টাগ্‌ অব্‌ ওয়ারের দড়িটা বাদ দেওয়া হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে ছেলেরা বুঝি প'ড়ে যাচ্ছে। দড়িটাই এই ছবির হারান অংশ। এই রকমের আরো ৬টি ছবি দেওয়া হ'লো, প্রত্যেকটিতে কোন একটি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে; ছবির নামেরও শুধু প্রথম অক্ষরগুলি দেওয়া হয়েছে। তোমরা বল্‌বে ছবি থেকে কি বাদ পড়েছে, আর ছবির নামই বা কি।

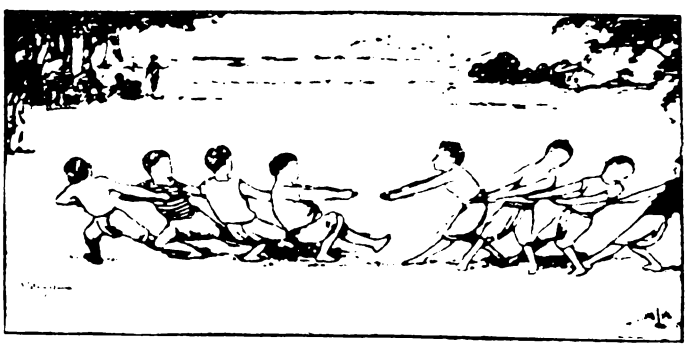

প্রতিযোগিতার ছবি—

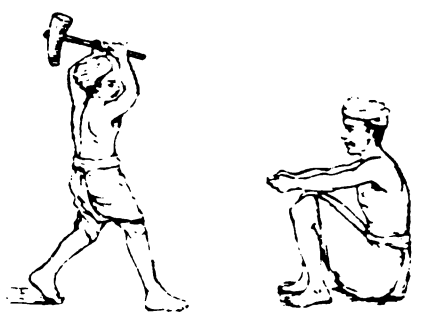

প — ক —

দো— দো— দা— দু—

ষাঁ— ব— "ফ— ছি— তা— র— পে— "

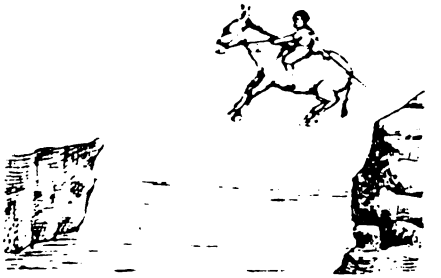

পু— উ— যে— য— আ—

সি —— চি —— !

সা —— সো —— !

নিয়মাবলী

১। সতের বছরের কম বয়সের সব গ্রাহক/পাঠক যোগ দিতে পারবে।

২। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরির ছাত্র, মেম্বারাও ব্যক্তিগত ভাবে যোগ দিতে পারবে।

৩। নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে।

৪। যারা গ্রাহক নয় তারা নিচের ফর্মটা ভর্তি করে পাঠিয়ে দেবে উত্তরের সঙ্গে।

৫। ৩০শে জুনের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছান চাই।

৬। একই নম্বরে একাধিক গ্রাহক থাকলে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিতে পারবে।

ক বিভাগ—যাদের বয়স ১২র কম-১০০·০০

খ বিভাগ—বয়স ১২ বা তার বেশী কিন্তু ১৭র কম-১০০·০০

(দরকার হলে পুরস্কার ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে।)

লাইন বরাবর কেটে পৃষ্ঠার তলার অংশ আলগা করে নাও।

যারা গ্রাহক নও তাদের জন্য

নাম _____ বয়স _____

ঠিকানা

_____

_____

_____

জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রতিযোগিতা

তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাবার স্মৃতি রক্ষার জন্য সন্দেশের গ্রাহকদের তিনশ' টাকা পুরস্কার দিচ্ছেন।

একটা ধপধপে কাগজ আছে হাতের কাছে ? খসখস করে চটপট একটা গল্প লিখে ফেলত। ১৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে গল্পে এই ধরনের শব্দ, যেমন কুচকুচে, টকটকে, প্যাচপ্যাচে, খিট-খিটে ইত্যাদি যত বেশি সংখ্যক সম্ভব ব্যবহার করবে।

গল্প কেমন হয়েছে তাও দেখা হবে আবার এই ধরণের শব্দ কটা ব্যবহার করেছ সেটাও দেখা হবে। দেখি কে কেমন লিখতে পার।

নিয়মাবলী

১। সতের বছরের কম বয়সের সব গ্রাহক যোগ দিতে পারবে।

২। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরীর ছাত্র, মেম্বাররাও ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিতে পারবে।

৩। নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে।

৪। ৩০শে জুনের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছান চাই।

৫। একই নম্বরে একাধিক গ্রাহক থাকলে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিতে পারবে।

৬। ৩০শে জুনের মধ্যে গ্রাহকের চাঁদাও আমাদের হাতে এসে পৌঁছন চাই।

৭। যারা গ্রাহক নও, তারাও ৩০ জুনের মধ্যে গ্রাহক হলে যোগ দিতে পারবে।

৮। ক-বিভাগ—যাদের বয়স ১২ বছরের কম—
প্রথম পুরস্কার—৬০.০০, দ্বিতীয় পুরস্কার—৫০.০০, তৃতীয় পুরস্কার—৪০.০০,
খ-বিভাগ—যাদের বয়স ১২ অথবা তার চেয়ে বেশি, কিন্তু ১৭ বছরের কম।
প্রথম পুরস্কার—৬০.০০, দ্বিতীয় পুরস্কার—৫০.০০, তৃতীয় পুরস্কার—৪০.০০।
দরকার হলে পুরস্কারগুলি ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে।

অরিজিৎ সেনগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার প্রতিযোগিতা

অধ্যাপক ডঃ কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও ডঃ শ্রীমতী শুভা সেনগুপ্তর একমাত্র সন্তান, আমাদের প্রিয় ১৪২৭ নং গ্রাহক, অরিজিৎ ১৯৯০, ২৩শে জানুয়ারি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তার জন্ম হয়েছিল ২১শে মে, ১৯৬৮। কৃতী ছাত্র ছিল সে। ১৯৮৯ পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। চমৎকার গান করত, সাহিত্যে অনুরাগী ছিল, ভাল ছিল খেলাধূলায় হাসিখুসি, সুমিষ্ট, সপ্রতিভ স্বভাব ও উদার, অনাবিল চরিত্রের জন্য অরিজিৎ সবার প্রিয় ছিল।

সন্দেশকে অরিজিৎ ছোটবেলা থেকে বড় ভালবাসত। সন্দেশে তার স্মৃতি রক্ষার জন্য তার বাবা-মা একটি বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন, সফল গ্রাহক-পাঠকদের তাঁরা ১১০৲ টাকা পুরস্কার দেবেন।

'মাসি গো মাসি পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম।'

তারপর? আর ত জানি না! তোমরা কেউ ওপরের চার লাইন কবিতার সঙ্গে মানান সই আরো চার লাইন কবিতা লিখে পরের ব্যাপারটা জানাতে পার কি? দেখি, কে কত ভাল লিখতে পার।

নিয়মাবলী

১। সতের বছরের কম বয়সের সব গ্রাহক/পাঠক যোগ দিতে পারবে।

২। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরীর ছাত্র/মেম্বাররাও ব্যক্তিগতভাবে যোগ দিতে পারবে।

৩। একই নম্বরের একাধিক গ্রাহক থাকলে সবাই আলাদা আলাদা যোগ দিতে পারবে।

৪। নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে।

৫। ৩০শে জুনের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে আসা চাই।

৬। যারা গ্রাহক নয় তারা নিচের ফর্মটা ভর্তি করে উত্তরের সঙ্গে পাঠাবে।

ক-বিভাগে যাদের বয়স ১২র কম—পুরস্কার ৫৫.০০

খ-বিভাগে যাদের বয়স ১২ বা তার বেশী, ১৭র কম—পুরস্কার ৫৫.০০।

দরকার হলে পুরস্কার ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে।

লাইন বরাবর কেটে পৃষ্ঠার তলার অংশ আলগা করে নাও

যারা গ্রাহক নও তাদের জন্য

নাম _____ বয়স _____

ঠিকানা _____

_____

_____

All Calcuttans know all about *misti.*
Or do they.

- Who introduced the rossogolla at home and abroad ?
- Who first canned rossogollas ?
- Who invented the rossomalai ?
- Who first introduced a range of sweets for diabetics ?
- Who first thought of creating a 'sandesh' with 'chhanar payesh' inside it ? (Hint : it's called Amrita Kumbha)
- Who was the first to bring you a "sandesh cake" ?

Yes, you know all about *misti* if you just said K. C. Das.

K. C. Das

11 Esplanade East Tel no : 28 5920
3, St. Marx Road, Bangalore Tel : 56 9172

Ogilvy & Mather 1626B

কলকাতার বাইরে যেতে দূরপাল্লার বাসে

বেড়াবার মত পশ্চিমবঙ্গে কত জায়গাই তো আছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা দূরপাল্লা বাস-সার্ভিসের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেছে অল্প সময়ে ও কম খরচে।

দীঘা. বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন, সিউড়ী, রাঁচি, কেওনঝড়, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, পলাশী, বহরমপুর, ফরাক্কা, চিত্তরঞ্জন, পুরুলিয়া, হলদিয়া, ডায়মণ্ড হারবার, ঝাড়গ্রাম, নামখানা, কাকদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, রায়দীঘি, বাসন্তী, রামপুরহাট, জামশেদপুর, হাজারদুয়ারী কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বেথুয়াডহরী, শান্তিপুর, রাজগীর, হাজারীবাগ, দীঘা (রাত্রিকালীন সার্ভিস)।

এসব জায়গায় এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লার সার্ভিস চালু আছে।

টিকিট প্রাপ্তিস্থান :—
দূরপাল্লার বাস স্টেশন :
এসপ্লানেড—ফোন নং : ২৮ - ১৯১৬
উল্টোডাঙ্গা—ফোন নং : ৩৫ - ৪৭৬৬
দীঘা বুকিং অফিস।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা
৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ,
কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

নববর্ষে প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

- সেরা জাতের ছাপা সিল্ক শাড়ী।
- বাংলা তাঁতের শাড়ীর মনমাতানো রং আর ডিজাইনের আকর্ষণীয় সমাহার।
- পলিয়েস্টার, সিল্ক শার্টিংস, তসর এবং সুতি শার্টিংস, ধুতি ও লুঙ্গী।
- তাঁত ও ছাপা বেডসীট, বেড-কভার এবং রং-বেরঙের কম্বল।

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম এন্ড পাওয়ার লুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সংস্থা)
৮-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
(৭ম তল) কলিকাতা-৭০০০১৩

তন্তুশ্রী

বাংলার সেরা তাঁতের কাপড়

নিউস্ক্রিপ্টের বই মানেই ছোটদের ভাল বই

সুকুমার রায়—আবোল তাবোল,	১০.০০
হ য ব র ল	১০.০০
পুণ্যলতা চক্রবর্তী—ছেলেবেলার দিনগুলি	১২.০০
লীলা মজুমদার—উপেন্দ্রকিশোর	৮.০০
মাকু	৭.০০
আজগুবি	১০.০০
সত্যজিৎ রায়—প্রোফেসর শঙ্কু	২০.০০
একেই বলে শুটিং	১২.০০
নলিনী দাশ—হাতীঘিসার হানাবাড়ি	১২.০০
রানী রূপমতীর রহস্য	১০.০০
অলৌকিক বুদ্ধমূর্তি রহস্য	২০.০০
শিশিরকুমার মজুমদার—দালাং মিশনের ঘণ্টা	৮.০০
তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি	১২.০০
মঞ্জিল সেন—গঙ্গোত্রী রহস্য	৬.০০
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার অনূদিত	
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল—ম্যাবাকট ডীপ	১০.০০
রেবন্ত গোস্বামী—বাবলা ফুলের গন্ধে	১০.০০
নিরঞ্জন সিংহ—মহাকাল	১০.০০
প্রণব মুখোপাধ্যায়—নীল শ্যাওলার খোঁজে	৫.০০
বুড়ির ঝুড়ি	৫.০০
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—মিঠে কড়া পশুর ছড়া	৫.০০
মিঠে কড়া ভূতের ছড়া	৪.০০
নাম তাঁর সুকুমার	৪.০০
শিশির বিশ্বাস—বাঘবন্দী মন্তর	১০.০০
সুনির্মল চক্রবর্তী—গড়গড়িয়ে তরতরিয়ে	১০.০০
কলকাতার ছড়া	৬.০০
সম্পাদনা : লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়	
সেরা ভূতের গল্প সংকলন—অশরীরীর আসর	১৫.০০
সেরা রহস্য গল্পের সঙ্কলন—সরস রহস্য	৩০.০০
সুধীন্দ্র সরকার—অল্প কল্প গল্প	১০.০০
রূপক চট্টরাজ—এতোল বেতোল	১০.০০

নিউস্ক্রিপ্ট—এ ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

Regd. No. WB/SC : 102 SANDESH May, 1991 Price 5 00

মনে রেখো

উৎসবের দিন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হল

সন্দেশের লেখকরা অভিনয় করবেন আর মজা করবেন। সন্দেশীরা দেখবে।

গ্রাহকদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী, মজার সাজ আর স্বরচিত ছড়া-কবিতা ও ছোট ছোট গদ্য লেখা পড়া হবে।

* সমস্ত অনুষ্ঠান হবে ত্রিকোণ পার্কে, শরৎ সমিতির সভাগৃহে, রাসবিহারী এভিনিউতে, সন্দেশ কার্যালয়ের ঠিক সামনে।

* ৫ই মের মধ্যে নিজের লেখা, ছড়া, কবিতা আর ছোট গদ্য লেখা আর নিজের আঁকা রঙিন বা সাদা কালো ছবি জমা দাও।

* ১৯শে মে রবিবার জানতে পারবে ছবি / লেখা মনোনীত হল কিনা। একবার পড়ে শোনাতেও হবে।

* গ্রাহকেরা আর ছোট গ্রাহকদের সঙ্গে একজন অভিভাবক এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন।

* ১৮ই মে শনিবার থেকে ২৬শে মে রবিবারের মধ্যে আমন্ত্রণ পত্র কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। 'হল' খুব ছোট। মিলে-মিশে, বসে-দাঁড়িয়ে মজা করতে পারবে না? বিশদ নিয়মাবলীর জন্য ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

কালিকা প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ দ্বারা মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ হইতে
অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ—উজ্জ্বল দাশগুপ্ত, প্রসেস সিণ্ডিকেট কলিকাতা-৬
ফোন নং—৩১-৬৪৯৩ ও ৩৩-২২৫৭